জন্মতিথি

Estd:-1919.

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে

শ্রাবণ ১৩২৯

মূল্য ১

প্রকাশক
শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৭নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

মাস কয়েক পূর্ব্বে—এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া, সাহসে ভর করিয়া আমার বহু সম্মানাস্পদ মধ্যম মাতুল—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও নাট্যকার, নানা সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীহরনাথ বসু মহোদয়কে দেখাই। আমার পঠদ্দশায় এই গ্রন্থ লিখিত বলিয়া তিনি আমায় ভৎসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ং প্রবীণ সাহিত্যিক হইয়া, নবীন সাহিত্যসেবীর সাধনা নিষ্ফল হইতে দিতে পারেন নাই। তাই বহু যত্নে ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন পূর্ব্বক ইহাকে প্রকাশযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতে সাহস করিলাম না। শৈশব হইতে আমাদের বহু উপদ্রব তিনি সহ্য করিয়া আসিয়াছেন—ইহাও তাহারই অন্যতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিলাম।

আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যত্ন, আগ্রহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে ‘জন্মতিথি’র আদৌ জন্ম হইত কিনা—সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। সুতরাং তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য—সে ঋণ আমি ভুলিতে পারিব না।

যে কয়জনকে আমি প্রকৃত বন্ধু বলিয়া মনে করি—তাঁহাদের অন্যতম, সোদরোপম শ্রীকমলাকান্ত দালাল এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্যে নানারূপ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি।

বিনীত

শ্রাবণ ১৩২৯ — শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে

জন্ম তিথি

প্রথম পরিচ্ছেদ

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া সত্যেন্দ্র বিবাহ করিয়াছিল।

বস্তুতঃ, সত্যেন্দ্র যে সমাজের লোক, বা যে সমাজকে সে নিজের বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, সে সমাজের উপযোগী শিক্ষা বা আদর্শলাভ নলিনীর ভাগ্যে ঘটে নাই। যেহেতু, সে কোনও সমাজেরই অন্তর্গত না থাকিয়াও, এণ্ট্রান্সও পাশ করে নাই এবং তাহার বাপ ছিল দুর্দান্ত মাতাল। তথাপি যে সত্যেন্দ্র বিলাতফেরত, সুশিক্ষিত, এবং উদীয়মান ব্যারিষ্টার

হইয়াও তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল, সে শুধু তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর মধ্যস্থতায় নলিনীর স্নিগ্ধ হৃদয়খানির পরিচয় পাইয়া। সত্যেন্দ্রের ভগ্নী ও নলিনী ছিল সহপাঠী। এলাহাবাদ বালিকা-বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে উভয়েই পড়িত—এবং বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হইতে বৃদ্ধ দরওয়ান পর্য্যন্ত সকলেই জানিত, যে এই দুইটী তরুণী অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। উভয়েই উভয়ের গৃহে যাতায়াত করিত ও সেই সূত্রে সত্যেন্দ্র নলিনীকে অনেকবার দেখিয়াছিল, এবং বলা বাহুল্য অপছন্দ করে নাই। নলিনীর মুখখানিতে এমন একটি সকরুণ বিষণ্ণভাব অঙ্কিত থাকিত, যে তাহার কথা ভাবিতেও সত্যেন্দ্রের মনটি তাহার প্রতি সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ভগ্নীর মুখে নলিনীর সম্বন্ধে যেটুকু সে শুনিয়াছিল, তাহাতে তাহার চিত্ত তাহার দিকে আরও আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু তখন নলিনীর সহিত তাহার বিবাহ অসম্ভব এবং চিন্তারও অতীত ছিল। কারণ, সত্যেন্দ্র ছিল হিন্দু বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র এবং নলিনীর পিতা ছিলেন—বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় এবং কেতায়—পুরা দস্তর সাহেব। অধিকন্তু নলিনীর জননী মিসেস্ রায়, ধনী সিভিলিয়ান স্বামীর সহিত, 'বিলাত দেশটা মাটির' কিনা পরীক্ষা করিয়াও আসিয়াছিলেন; এবং ফলে তাঁহাদের এলাহাবাদস্থ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার

জন্ম তিথি

সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনের 'টেনিস কোর্টে' ইংরাজ অতিথি অভ্যাগতের সহিত টেনিস্‌ খেলিতে, বা উক্ত শ্বেতকায় মহাপুরুষবর্গের সহিত বন্ধুগণের স্বাস্থ্যপান করিতে দ্বিধা প্রকাশ করাটা কুসংস্কার ও কাপুরুষতা বলিয়াই মনে করিতেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে মিঃ ও মিসেস্‌ রায়ের মতটা ছিল অতিশয় প্রশস্ত ও উদার। মিঃ রায় হিন্দু সন্তান ছিলেন। কিন্তু উক্ত হতভাগ্য সমাজের বিপক্ষে সাধ্যমত বিদ্রোহ করিয়াও উহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। যদি কোনও সতীর্থ তাঁহাকে বলিতেন "ওহে, সব রকমইতো চালাচ্ছ, তবে আর ও ধর্ম্মের বালাইটুকু রেখেছ কেন? হয় গির্জ্জায় না হয় ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একটা দীক্ষা নিয়ে নাওনা কেন?" তার উত্তরে তিনি রসিকতা করিয়া কহিতেন, "জাননা হে, আমাদের বিশ্বাসী জাত, যাবার নয়।"

মিসেস্‌ রায় ব্রাহ্মকন্যা ছিলেন এবং বেথুন কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করিয়াছিলেন। বিবাহটা ব্রাহ্ম মতেই হইয়াছিল। তখন মিঃ রায় সিভিলিয়ান হইয়া কয়েক বৎসর মাত্র ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন। মিসেস্‌ রায়ের সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল,—এবং মিঃ রায়ের সুন্দরী স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল। সুতরাং হিন্দুমতে মন্ত্র পড়িতে বা ব্রাহ্মমতে প্রতিজ্ঞা করিতে, কিছুতেই তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

বিবাহের পর মিঃ রায় সস্ত্রীক একবার বিলাতে গমন

করিয়া ছিলেন। তখন নলিনী দুই বৎসরের। মিসেস্ রায়ের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শীঘ্রই লণ্ডন সহরে রাষ্ট্র হইয়াছিল এবং অনেক ইংরাজ তনয় এই নেটিভ বিউটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার সময় মিঃ মন্‌রো নামে এক ধনী ইংরাজ যুবক ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্যে রায় পরিবারের সহিত ভারতে আসিয়া, সারা ভারতবর্ষটা মাস দুয়েকের মধ্যে দর্শন করিয়া লইয়া, সাত মাস ধরিয়া এলাহাবাদ দর্শন করিলেন এবং পরে সহসা একদিন স্বদেশে ফিরিলেন। সেই দিনই পরিত্যক্ত দেশ হইতে কোনও দুঃসংবাদ আসায় রাত্রের ট্রেণে মিঃ রায়কে সপরিবারে বঙ্গদেশে ফিরিতে হইল। পরে মিঃ রায়ের এলাহাবাদস্থ এক বন্ধু তাঁহার পত্রে জানিলেন দুরন্ত কলেরা রোগে মিসেস্ রায়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার এক নিঃসন্তানা হিন্দু বিধবা ভগ্নীকে মাতৃহীনা নলিনীর অভিভাবিকাস্বরূপ লইয়া শীঘ্রই এলাহাবাদে ফিরিতেছেন।

মিঃ রায়ের এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার পত্নীপ্রেমের গভীরতা দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রায়ভবনের টেনিস্ কোর্টে ফলের বাগান করা হইল এবং বড় জুড়ী ও ল্যাণ্ডো গাড়ী বিক্রয় হইয়া গৃহস্বামীর ব্যবহারের জন্য একখানি মাত্র গাড়ী ও একটি দেশী ঘোড়া অবশিষ্ট রহিল। বৃহৎও ক্ষুদ্রকায় নানাজাতীয় কুকুরগুলা বিলাইয়া দেওয়া হইল

এবং সারমেয়রক্ষক মেথরপুঙ্গবের জবাব হইল। কেবল গৃহস্বামীর মদের মাত্রাটা কিছু অতিরিক্ত হইল। লোকে বলিতে লাগিল, আহা! স্ত্রীর শোকে লোকটা পাগলের মত হইয়াছে।

মিঃ রায়ের ভগ্নী ছিলেন পাকা গৃহিণী এবং শিক্ষিত হিন্দুনারী। তাঁহার প্রকৃতির এইটুকু বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যাহা ন্যায্য বিবেচনা করিতেন—তাহা সম্পন্ন করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না—বরং সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উহা সম্পন্ন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা বিপথগামী হইলেও হিন্দুধর্ম্ম যে কখনও ত্যাগ করেন নাই—ইহা তিনি জানিতেন। এবং জানিতেন বলিয়াই আত্মীয় অনাত্মীয়ের সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও নিঃসঙ্কোচে ভ্রাতার সহিত এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই সহোদরের প্রবাস বা আবাস গৃহে তিনি যে সমস্ত সংস্কার সাধন করিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ে তিনি সহোদরের নিকট হার মানিলেন—সে নলিনীর শিক্ষা। ভগ্নীর সহস্র অনুরোধ স্বত্বেও মিঃ রায় নলিনীকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন না। সত্যেনের ভগ্নীর সহিত তাহার স্কুলেই আলাপ হইয়াছিল—এবং সে আলাপ যেরূপ ঘনিষ্ঠতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রের মাতা এলাহাবাদের পুরাতন বাসিন্দা। মিঃ রায়ের ও তাঁহাদের পরিবারের এই সমস্ত পুরাণো কথা কিছুই তাঁহার

অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং এমন অবস্থায় তিনি যে কোন মতেই বিবাহে সম্মতি দিবেন না ইহা একরূপ জানাই ছিল। কিন্তু অদৃষ্টের গতি রহস্যময় এবং উহা কখন কিরূপে কাহার সহিত কাহাকে যে বাঁধিয়া দেয় তাহা বোধ করি বিধাতারও জ্ঞানের অগোচর।

সত্যেন্দ্রের ভগ্নীর বিবাহের অব্যবহিত পরেই সত্যেন্দ্রের জননীর মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধান্তে ভগ্নীপতি পরামর্শ দিলেন—তোমাদের তো অর্থেরও অভাব নেই আর বাড়ীতে লোকও কেউ নেই, আর তুমি নিজেও তো 'পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।' তা এই সুযোগে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারিটা পাশ করে এসে নিজের একটা হিল্লে করে নাও না।

পরামর্শ সত্যেন্দ্রের পছন্দ হইল এবং নিদাঘের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে সে বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে বেজ্‌ওয়াটার পল্লীর ছাত্রাবাসে থাকিয়া সে প্রায় প্রতি মেলেই ভগ্নী ও ভগ্নীপতির পত্র পাইত। তাহার ভগ্নী নলিনীর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও সংবাদ থাকিলেই তাহা ভ্রাতার গোচর করিত। তাহারই একখানা পত্রে সত্যেন্দ্র জানিল, যে ক্লাসের সর্ব্বোত্তমা ছাত্রী হইয়াও পিসীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নলিনীকে স্কুল ছাড়িতে হইয়াছে। তাহার ভগ্নী দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিল, আমরা হিঁদুর মেয়ে। য়ুনিভার্সিটির মুখ দেখবার আশা করাও আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু নলিনীর বাপের তো ধর্ম্মের কোনও বালাই নেই। তিনি যে বোনের কথায় কেন নলিনীকে স্কুল ছাড়ালেন, তা তো বুঝতে পার্লেম না। হয়তো আমার দাদার মতই তিনি তাঁর বোনটিকে বড্ড বেশী ভালবাসেন এবং আমার ভাইটির মতই তার অনুরোধ এড়াতে পারেন না। নলিনীর গুণের কথা আমি বলে শেষ কর্ত্তে পারিনা। সে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে স্কুল ছাড়লে বটে—কিন্তু ইংরাজী বোধ করি সে বি, এ, ক্লাসের রিষ্টওয়াচ বাঁধা চশমা পরা যে কোনও ছাত্রকে শিখিয়ে দিতে পারে। পড়তে দিলে সে যে এম, এ তে একটা ফার্ষ্ট ক্লাস ও আর

সবগুলো পরীক্ষায় জলপানি পেত, আমার তাতে কোনও সন্দেহই নেই। রাগ ক'র না, তাকে দেখে ঐরকম একটি বৌদিদি পাবার জন্যে আমার এমন লোভ হয় যে কি বলব। আহা, যদি কোনও উপায় থাকতো! আচ্ছা দাদা, তা কি কিছুতেই হতে পারে না? ভেবে দেখ না! তুমি তো এখন সাহেব হচ্ছ— একটা কোনও সাহেবী উপায় বার কর্ত্তে পার না? ও হরি, আমি কাকে কি বল্‌ছি? তুমি যে এখন বিলাতে! ফুলওয়ালী থেকে রুটিওয়ালী পর্য্যন্ত সবাই যে মেম! এমন কি তোমার দাসীটা পর্য্যন্ত। তোমার কি এখন ভারতের ডাটি মেয়েদের মনে ধরবে? তা না ধরুক—কিন্তু নলিনীর মতো—তোমার সাহেবী ভাষায় যাকে appealing beauty বলে—সেই রকম সুশ্রী মেম তুমি কটা দেখছ আমায় জানিওতো! আমার জান্তে বড্ড কৌতূহল হয়। আর নলিনীর বিয়ের জন্যে আমি ভাবিনা—কারণ তার রূপ আছে এবং বাপের অনেক টাকা আছে। তার বিয়ের জন্যে আটকাবে না।

কিন্তু বন্ধুর নির্ভাবনা স্বত্বেও নলিনীর বিবাহ আটকাইল। কোনওবার বর এবং কখনও ঘর, এই দুইটির পালা করিয়া অপছন্দ হওয়ার দরুণ সত্যেন্দ্র ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হইল না। ইতিমধ্যে ভগ্নীর আর একখানা পত্রে সত্যেন্দ্র জানিল—মিঃ রায় অমিত মদ্যপায়ীর স্বাভাবিক রোগে আক্রান্ত

হইয়া পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়াছেন—এবং নলিনী শয্যাশায়ী পিতার যথেষ্ট সেবা করিতেছে।

তারপর অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি হইতে বি, এ, পাশ করিবার অল্পকাল পরেই সত্যেন্দ্রের ভগ্নীর Influenza রোগে মৃত্যু হইল। প্রাণাধিকা ভগ্নীর মৃত্যুতে সত্যেন্দ্র যে শোক পাইল—তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক, দুরন্ত শোক বক্ষে চাপিয়া, সে কোনও মতে ব্যারিষ্টারীটা পাশ করিয়া, দেশে ফিরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করিল এবং কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতে লাগিল। মিঃ রায় তখনও জীবন্মৃত অবস্থায় দিনযাপন করিতে ছিলেন। তিনি এক বন্ধুর নিকট সত্যেন্দ্রকে একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার জানিয়া তাহার সহিত নলিনীর বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘটক হইল সত্যেন্দ্রের ভগ্নীপতি। সে ছিল ডাক্তার এবং যে সাহেবডাক্তার মিঃ রায়ের চিকিৎসা করিতেন—তাঁহার জুনিয়ার। বিবাহের পূর্ব্বে অনেকে কন্যার কুলের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া সত্যেন্দ্রকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু বোধ করি, মৃতা ভগ্নীর অনুরোধ ও নলিনীর পূর্ব্ব পরিচয় নিবন্ধন সত্যেন্দ্র আপত্তি করে নাই।

বিবাহের দুই বৎসর পরেই মিঃ রায়ের মৃত্যু হইল এবং সত্যেন্দ্র ও নলিনী তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল। নলিনীর পিসিমা ৺ কাশীবাস করিলেন এবং তাঁহার

বিস্তর আপত্তি স্বত্বেও সত্যেন্দ্র কাশীতে তাঁহার নামে একখানি বাটি ও ২৫ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া দিলেন।

লণ্ডনে যে ছাত্রাবাসে থাকিয়া সত্যেন্দ্র ব্যারিষ্টারী পড়িত, সত্যেন্দ্রের এক সতীর্থ সেই ছাত্রাবাস হইতেই ডাক্তারী এফ, আর, সি, এস, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া এবং পাশ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া প্র্যাকটীস্ সুরু করিয়াছিল। সত্যেন্দ্রের বিবাহের সময় মিষ্টান্নের ভাগ হইতে সে বাদ পড়ে নাই। বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কলিকাতা হইতে তাহাকে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিতে হইয়াছিল। বিবাহের পর অনিলাঙ্গের সহিত সত্যেন্দ্র তাহার নবপরিণীতা স্ত্রীর পরিচয় করাইয়া দিল। অনিল প্রায় মাসাবধি কাল বন্ধুগৃহে কাটাইয়া বন্ধুপত্নীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া কলিকাতায় ফিরিল এবং সত্যেন্দ্রকে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকৃটিস্ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। শ্বশুরের মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্র সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে লাগিল। তখন সত্যেন্দ্রের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া অনিলের সহিত সত্যেন্দ্রের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হইল এবং নলিনীও অনিলকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতে শিখিল। বিলাতে পড়িবার সময় এক ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষার্থিনী বঙ্গ-রমণীর সহিত এই দুটি বন্ধুর আলাপ হইয়াছিল। তিনিও এই সময় কলিকাতায় প্র্যাকৃটিস্ করিতেছিলেন। মিসেস্ সরোজিনী দাসের

জন্ম তিথি

স্বভাব ও বয়স সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিলেও কেহই তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিতে পারিত না। কলিকাতায় আসিয়া, কোনও কারণ বশতঃ সত্যেন্দ্রের সহিত সরোজিনীর পরিচয় কিছু ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লোকে কাণাঘুসা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তখন অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ। কলিকাতার প্রভাত বায়ুতে আসন্ন শীতের আভাস দিতেছিল এবং সত্যেন্দ্রের বালিগঞ্জস্থ অট্টালিকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে শ্যামল ঘাসগুলির শীর্ষে রাত্রের শিশির বিন্দুগুলি টলমল করিতেছিল। প্রভাতসূর্য্য-কিরণ সেই শিশিরের ফোঁটাগুলির স্পর্শে নানা রঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সহরপ্রান্তের জনবিরল পথে কদাচিৎ দুই একটি অশ্বারোহী ইংরাজ পুরুষ বা নারী প্রাতঃভ্রমণ সমাধা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

মুক্ত জানালার তলে দাঁড়াইয়া সদ্যস্নাতা নলিনী সেই প্রভাতদৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে বহুদিনের পুরানো অনেক জীর্ণ স্মৃতি হৃদয়মন্দির হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল। আজ তাহার জন্মদিন। মনে পড়িল, তাহার পিসিমা এই দিনে তাহাদের এলাহাবাদের গৃহসন্নিকটস্থ মন্দিরে তাহার কল্যাণে পূজা পাঠাইতেন এবং তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র পরাইয়া পিতাকে নমস্কার করিতে পাঠাইতেন। পিতৃ-প্রণামান্তে যখন সে পিসিমার চরণে প্রণতা হইত, তখন তিনি সস্নেহে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া

ধরিয়া কহিতেন—সতী-সাবিত্রী হও মা; এর বেশী আর কিছু আমি চাহি না।

এই সব বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীর স্মরণে তাহার বৃহৎ আঁখি দুটি সিক্ত হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়• বাবুলাল খানসামা আসিয়া কহিল, মা,—স্যাকরা এই বাক্সটা নিয়ে এসেছে। আপনি দেখে নিয়ে এই কাগজটায় একটা সই দিয়ে দিন—সে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজখানা হাতে লইয়া নলিনী দেখিল উহাতে এক জোড়া ব্রেস্‌লেট প্রাপ্তি স্বীকার করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সে বাক্স খুলিয়া দেখিল উহাতে একজোড়া হীরার ব্রেস্‌লেট রহিয়াছে। কাগজখানা সই করিয়া, খানসামাকে বিদায় দিয়া, বালা জোড়া সে তুলিয়া দেখিল উহার এক কোণে ইংরাজীতে ছোট ছোট করিয়া লেখা রহিয়াছে: 'নলিনীর অষ্টাদশ জন্মতিথি উপলক্ষে তাহার স্বামীর শুভেচ্ছাজ্ঞাপক সপ্রেম উপহার।' নলিনী কৃতজ্ঞচিত্তে স্বামীকে স্মরণ করিয়া ব্রেস্‌লেট জোড়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় মালী আসিয়া একরাশি ফুল নামাইয়া দিয়া কহিল—সাহেব নতুন বাগান থেকে আজ এই ফুল আনতে হুকুম করেছিলেন—সেখানকার মালী এই দিয়ে গেল। বলিয়া ফুল নামাইয়া দিয়া ময়লা মোটা চাদর খানায় কাঁধের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর অকৃত্রিম স্নেহের এই কুসুমিত নিদর্শনে নলিনীর

জন্ম তিথি

হৃদয়খানি তখন প্রেমে আপ্লুত হইয়া তাহার অনুপস্থিত স্বামীর পানে ধাবিত হইতেছিল। এই সময় বাবুলাল তাহার চিন্তা স্রোত রুদ্ধ করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, ডাক্তার বাবু এসেছেন।

ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিয়াই নলিনী তাঁহাকে সেই কক্ষেই আসিতে অনুরোধ করিতে আদেশ করিয়া ফুলগুলি তুলিয়া ফুলদানীতে সাজাইতে লাগিল। বাবুলাল্ যাইবার অল্পক্ষণ পরেই অনিল সহাস্য বদনে—গুড্ মর্ণিং, তারপর, কেমন আছেন বলুন—বলিতে বলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া হাত বাড়াইয়া দিল।

নলিনী কহিল, গুড্ মর্ণিং, কিন্তু শেক হ্যাণ্ড কর্ত্তে পার্ব্ব না। আপনার হাত ময়লা হয়ে যাবে—আমি এতক্ষণ ফুল ঘাটছিলুম। চাই কি ডাক্তার বাবুর Sterile হাত হয়তো septic হয়ে যাবে—কি বলেন!

বলিয়া সে হাসিল, পরে কহিল, এই দেখুন, আমাদের সেদিন যে নতুন বাগান কেনা হ'ল সেখান থেকে এই ফুল এসেছে। কেমন ফুল বলুনতো?

অনিল হাসিয়া কহিল, চমৎকার। কিন্তু ওর অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই ধার করা। মহাজন—ইওর ম্যাজেষ্টিক মৃণাল ভুজদ্বয়।

নলিনীর সহাস্য অধরে বিরক্তির ঈষৎ কঠিন আভা ফুটিয়া

উঠিল—কিন্তু অনিল তাহা লক্ষ্য না করিয়াই কহিল, বাঃ চমৎকার ব্রেস্‌লেটটিতো!

হীরক বলয়ের প্রশংসায় নলিনীর মুখের নষ্টদীপ্তি মুহূর্ত্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল, বেশ নয়? আবার কি লেখা আছে পড়ে দেখুন?

অনিল বালাজোড়া তুলিয়া লেখাটুক পড়িতে লাগিল। নলিনী পুনরায় কহিল, আমিও এই সবে মাত্র পেলুম। এটি আমার স্বামী আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমায় উপহার দিয়েছেন। হাঁ।—ভাল কথা, আজ আমার জন্মদিন—জানেন?

অনিল মাথা নাড়িয়া কহিল, কৈ না, সত্যি? পরক্ষণে পুনরায় অর্থসূচক ঘাড় দোলাইয়া কহিল—ও, তাই বুঝি সত্যেন আমায় আজ রাত্রে এখানে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন করে এসেছে!

নলিনী কহিল, হাঁ, আজ আমি সাবালিকা হলুম। আজকের দিনটা আমার পক্ষে স্মরণীয় দিন। তাই মিঃ সেন আজ সন্ধ্যার পর একটি ছোট খাটো পার্টির আয়োজন করেছেন। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে—বসুন!

নিকটবর্ত্তী একখানা সোফার উপর বসিয়া পড়িয়া অনিল কহিল, দেখুন দেখি, সত্যেন যখন যায় তখন আমি বাড়ী ছিলেম না। কিন্তু তার উচিত ছিল না কি দু-ছত্র লিখে আমায় একথা জানানো?

আমি তাহলে আপনাদের বাড়ীখানা ফুলে ঢেকে দিতুম। আমার বাগানের ফুল আপনার স্পর্শে ধন্য হয়ে যেত।

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে আবেগ ধ্বনিত হইল।

পরিহাসের লঘুভাব কাটাইয়া নলিনীর মুখখানি নিমিষে গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে কহিল, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী, আপনি আরও কয়েকদিন এইসব কথা বলেছিলেন, আবার আজও বলছেন। তাই আমি সত্যের অনুরোধে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার মুখে এ ভাষা আমি পছন্দ করি না।

অনিলের সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখখানায় কে যেন কালী ঢালিয়া দিল। সে বিষণ্ণভাবে কহিল, আমি কি আপনাকে বিরক্ত কল্লুম মিসেস্ সেন ?

এই সময় চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ভৃত্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

নলিনী ভৃত্যের পানে চাহিয়া কহিল, ঐ খানে রেখে যাও। বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চায়ের টেবিল দেখাইয়া দিল। পরে অনিলের দিকে ফিরিয়া সহজভাবে বলিল, ও সব কথা এখন থাক্। চা খাবেন আসুন।

ভৃত্য ট্রেখানা টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে, অনিল ধীরে ধীরে সেই টেবিলখানার পাশে একখানা চেয়ার

অধিকার করিল। কিছুক্ষণ কোনও কথাবার্তা হইল না এবং নলিনী কেৎলী শূন্য করিয়া চা ঢালিয়া কাপটা আগাইয়া দিল।

অনিল বাটির দিকে মুখ রাখিয়াই চা পান করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া সে কহিল, আমার মনের অবস্থা খারাপ, হয়তো অজান্তে কখনও আপনাকে ব্যথা দিয়েছি। কিন্তু সে কবে—তা জিজ্ঞাসা কর্লে কি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন?

নলিনীর স্বর আরও গম্ভীর হইল। সে কহিল, সেদিন আপনার বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণে, আপনি শুধু আমার কাছে কাছেই ছিলেন। আমার দিক দিয়ে না দেখলেও, পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করে, একজনের ওপর এই পক্ষপাত—একি আপনার পক্ষেই ভাল হয়েছে? আপনিই বলুন, আপনি কারণে অকারণে শুধু আমার সঙ্গেই কথা কইছিলেন কি না?

একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া অনিল কহিল, কিন্তু শুধু ঐ পর্য্যন্ত মিসেস্ সেন, ওর বেশী এগোবার আমাদের ক্ষমতা নেই। তারপর ব্যাপারটাকে যেন একটু লঘু করিয়া দিবার জন্য সে হাসিয়া বলিল, ফাঁকা কথা ছাড়া আর কিছু দিয়ে অতিথি সৎকার করা আমরা দরকার মনে করি না। কারণ আমরা civilised—অর্থাৎ বিলেত ফেরৎ।

মুখের গাম্ভীর্য্য অটুট রাখিয়া ঈষৎ কঠিন স্বরে নলিনী কহিল, না—হাসবেন না, ঠাট্টা নয়। আমি যথার্থ বলছি, পুরুষের স্তুতিবাদ

২

আমি পছন্দ করি না। যা মোটেই আন্তরিক নয়, সেই সব কথা বলে পুরুষ যে কি করে ভাবতে পারে যে তারা আমাদের মনোরঞ্জন কচ্ছে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

ডাক্তারের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল। দ্রবীভূত কোমল স্বরে সে কহিল, কিন্তু আমি আপনাকে আমার মনের কথাই বলেছি মিসেস্ সেন!

নলিনী জোরের সহিত কহিল, না—আশা করি তা আপনি বলেন নি। পরে খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধাপূর্ণ স্বরে সে কহিল, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী, যদি কোনও কারণে আপনার সঙ্গে আমার মনান্তর ঘটে, তবে যথার্থই আমি ক্ষুব্ধ হব। কারণ, আপনি আমার স্বামীর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু—আর তা ছাড়া এও আপনি জানেন, যে আপনাকে আমার ভালই লাগে। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজন লোক যেমন, আপনাকে যদি আমি সেই চক্ষে দেখতুম, তবে আপনি আমার এতদূর শ্রদ্ধার পাত্র হতেন কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, আমার কথা আপনি বিশ্বাস কর্ব্বেন কিনা বল্‌তে পারি না—কিন্তু আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে আপনি যথার্থই সুজন। সত্যি, আমার এক এক সময় কেমন মনে হয়, যে আপনি চেষ্টা করে লোকের কাছে নিজেকে মন্দ বলে চালাতে চান।

শেষের দিকে নলিনীর কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ধ্বনিত হইল।

মৃদু হাস্য সহকারে অনিল কহিল, মিসেস্ সেন, সকলেরই একটা না একটা খেয়াল থাকে।

নলিনী কহিল, কিন্তু এ আপনার কি অদ্ভুত খেয়াল?

চায়ের বাটিটা ঠেলিয়া রাখিয়া অনিল কহিল, দেখুন, অন্তরের নীচতাকে মহত্ত্বের মুখোস পরিয়ে, এত লোক সমাজের বুকের ওপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে, যে আমার মনে হয় তার চেয়ে মন্দ সাজা ঢের ভাল। পরে হাসিয়া কহিল, কিন্তু দেখছি তাতেও মুস্কিল। কারণ আমি যদি মহত্ত্বের ভাণ করি, তবে লোকে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আমার কথায় বাঁদর নাচ নাচতেও বোধ করি দ্বিধা কর্ব্বে না। কিন্তু যদি আমি নিজের দোষগুলি লোককে দেখিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করি, তবে লোকে তা বিশ্বাস কর্ব্বে না। মানুষ এমনই নির্ব্বোধ।

নলিনী কহিল, তাহলে আপনার এই ইচ্ছা যে লোকে আপনাকেই বিশ্বাস করুক?

ডাক্তার আবেগের সহিত বলিল—না। লোক কাদের বলছেন মিসেস্ সেন? সব ভণ্ড। তাদের কথা আমি গ্রাহ্যও করি না। আমি চাই শুধু আপনি—আমায় বিশ্বাস করুন। আর কেউ নয়—শুধু আপনি।

পরিহাসের লঘুভাব মিসেস্ সেনের মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল। কেন, শুধু আমি কেন? এই বলিয়া সে সুবৃহৎ চক্ষু দুইটি

মেলিয়া ডাক্তারের পানে চাহিল। সে দৃষ্টি যেন অনিলকে বিদ্ধ করিল। সে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কেন? মিসেস্ সেন! আমি আপনাকে অন্ততঃ বন্ধু রূপে পেতে চাই। আসুন, আমরা দুজনে বন্ধু হই। হয়তো আমার বন্ধুত্ব একদিন আপনার উপকারে আস্‌বে।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, কেন? এ কথা বলছেন কেন?

অনিল বলিল, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আপদে বিপদে কার না বন্ধু বান্ধবের দরকার হয়?

নলিনী কঠিন পুরুষ-কণ্ঠে কহিল, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী, এখনই আমাদের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে। আর এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, যতদিন এই সব অর্থহীন কথা বলে আপনি তা ছিন্ন না করেন। আপনি হয়তো মনে মনে হাসছেন। আমাকে গোঁড়া বলে মনে কর্চ্ছেন। কিন্তু তাতে আমি আপনাকে দোষ দিই না। এ বিষয়ে আমি গোঁড়াই বটে। আমি এমনই শিক্ষাই পেয়েছি। আর তার জন্যে আমি একটুও দুঃখিত নই। আপনি তো জানেন, আমি আমার পিসীর কাছে মানুষ হয়েছি। মাকে আমার মনেই পড়ে না। আমার পিসীমার মত এ সব বিষয়ে অত্যন্ত কড়া রকমের ছিল। সমাজ যে শিক্ষা আজকাল বিস্মৃত হচ্ছে, তিনি আমায় সেই শিক্ষাই বিশেষ করে দিয়েছিলেন। তিনি ভালকে যেমন নিছক ভাল বলে গ্রহণ কর্ত্তেন, মন্দকেও তেমনি নিছক মন্দ বলেই

পরিহার কর্তেন। দুয়ের মধ্যে একটা মেটামেটী করে নিয়ে চলা তাঁর প্রকৃতির বাইরে ছিল। আমাকেও তিনি এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত অনিল ডাকিল, মিসেস্ সেন!

পূর্ব্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নলিনী কহিল—আপনি নিশ্চয় মনে কর্চ্ছেন যে আমি নিতান্ত সেকেলে। যথার্থই আমি তাই। আর তাতে আমি লজ্জিত হবার কোনও কারণ দেখি না—বরং তা না হলে আমি দুঃখিত হতুম।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, এ কালটাকে কি আপনি ভাল বিবেচনা করেন না?

নলিনী সবেগে কহিল—না। কারণ, এ কালের লোকে জীবনটাকে একটা বাজীর মতন ধরে নেয়। কিন্তু সত্যই কি তাই? আমারতো তা বিশ্বাস হয় না। হয়তো আমার মুখে বুড়ুটে শোনাবে, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, যে যতই হীন হোক না কেন, সকলেরই জীবনের একটা চরম পরিণতি আছে। আর ত্যাগই মানুষকে সেই পথে নিয়ে যায়।

নলিনীর অকপট উক্তি অনিলের অন্তরে প্রবেশ করিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরে কহিল, আপনি কি মনে করেন—আচ্ছা—এক নববিবাহিত দম্পতীর কথাই ধরুন। মনে করুন বিবাহের পর দু'বছর যেতে না যেতে স্বামী এক অজ্ঞাত-

চরিত্র নারীর সঙ্গে বিশেষ মেশামেশী সুরু কর্লে। ঘন ঘন তার কাছে যাওয়া—তার বাড়ীতে খাওয়া, এমন কি তাকে পয়সা কড়ি পর্য্যন্ত দিতে আরম্ভ কর্লে। এমন অবস্থায় আপনার মত কি—নিরপরাধিনী স্ত্রী স্বামীর এই সব অত্যাচার সহ্য কর্ব্বে?

নলিনী বোধ করি এই নিগূঢ় ইঙ্গিতের ধার দিয়াও গেল না। সে সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—কর্ব্বে না?

অনিল কহিল, যদি আমার মত চান তবে আমি বলি—না।

নলিনী হাসিল। কহিল, তাহলে আপনার মত এই যে, স্বামী যদি বিপথগামী হয়—স্ত্রীও সেই মহাজনেরই পদাঙ্ক অনুসরণ কর্ব্বে?

অনিল যেন একটু মুসড়াইয়া গেল। সে বলিল, 'বিপথ' কথাটা একটু কঠোর শোনায় বটে, কিন্তু—

তাহার কথায় বাধা দিয়া নলিনী কহিল,—এ বিষয়টাই যে কঠোর—

অনিল কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, দেখুন, আমার মনে হয় ভাল লোকের দ্বারা সংসারে ক্ষতিই বেশী হয়। তারা অকারণ গলাবাজী করে মন্দটাকেই বড় করে দেখে। মানুষকে ভাল আর মন্দ—এই দু'রকমে ভাগ করার মত ভুল আমার বিবেচনায় আর নেই। কারণ যাকে যার ভাল লাগে তার

কাছে সেই ভাল, আর যাকে মন্দ লাগে সেই তার কাছে মন্দ। কিন্তু আর একজনের কাছে হয়তো ঠিক তার উল্টো। এই ধরুন আপনি। আপনাকে আমার ভাল লাগে। পরে হাসিয়া কহিল, কিন্তু তা বলে কি আমি আপনাকে দোষ দেব?

নলিনী কোন কথা না কহিয়া হাতের কাছে calling bell টা টিপিল। অল্পকাল পরেই ভৃত্য প্রবেশ করিবামাত্র সে চায়ের বাটিগুলা লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সে প্রস্থান করিলে অনিল পুনরায় কথার পূর্ব্বসূত্র অনুসরণ করিয়া কহিল, কিন্তু একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য কর্চ্ছি। আপনি এ কালের ওপর বড়ই চটা। বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ফেলিল। পরে পুনরায় কহিল, অবশ্য আমি একালের হয়ে তর্ক কচ্ছি বলে মনে কর্ব্বেন না যে আমি এ কালের বিশেষ পক্ষপাতী। বরং তা নই, তার কারণ কি জানেন? এ কালের মেয়েরা—এই পর্য্যন্ত বলিবার পর কে যেন তাহার মুখে চাপিয়া ধরিল। সে কণ্ঠ-স্বর আর একটু কোমল করিয়া কহিল, একালের মেয়েরা—বিশেষ যাঁরা শিক্ষিত—তাঁরা একটু স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকেন। মুখে উচ্চারণ না করিলেও অনিল যাহা বলিতেছিল তাহা নলিনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

ডাক্তারের কথার সেই অর্থই গ্রহণ করিয়া সে গম্ভীরস্বরে বলিল, তাদের কথা ছেড়ে দিন।

এই সমস্ত কথা শেষ করিবার এই ইঙ্গিত গ্রহণ না করিয়া অনিল বলিল, আচ্ছা তাদের কথা না হয় নাই ধল্লুম। কিন্তু ধরুন যে সমস্ত স্ত্রীলোক—আপনি যাকে অপরাধ বল্‌ছেন, ভ্রমক্রমে সেই রকম অপরাধই করে ফেলেছে—তাদের কি মার্জ্জনা নেই?

নলিনী সহজ ও শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—না।

কিন্তু ডাক্তারের কৌতূহল এখনও নিবৃত্ত হইল না। সে পুনরায় কহিল, কিন্তু পুরুষ? আপনার মতে কি পুরুষের সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম?

সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নলিনী কহিল,—নিশ্চয়ই।

ডাক্তার বলিল, কিন্তু জীবনটাকে এইরকম বাঁধা ধরা নিয়মে চালান কি কঠিন নয়?

নলিনী এবার হাসিল। কহিল, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী, এই রকম বাঁধা ধরা নিয়মের গণ্ডীর ভেতর থাকলে, বরঞ্চ এই জটিল জীবনটা অনেকটা সরল হয়ে আসে।

ডাক্তার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, আপনার মতে তাহ'লে এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়?

নলিনী পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়স্বরে কহিল—না।

ডাক্তার কহিল, যথার্থই আপনি গোঁড়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনিল উঠি উঠি করিতেছে—এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া মিসেস্ তরঙ্গিনী গুপ্তার আগমন সংবাদ দিয়া গেল। মিসেস্ গুপ্তা স্থূলাঙ্গী ও ঘন শ্যামবর্ণ। ঘনশ্যাম বলিবার অর্থ এই যে, তাঁহার কয়েকটি পুরুষ বন্ধু—অবশ্য তাঁহার অসাক্ষাতে—তাঁহাকে Dense darkness বলিয়া অভিহিত করিতেন। মিঃ গুপ্ত—এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ পত্রে ঘন ঘন চিঠি লেখা ব্যতীত আর কিছু করেন বলিয়া শোনা যায় নাই। তাঁহার পিতার কিছু অর্থ ছিল এবং তরঙ্গিনীকে সহধর্ম্মিণী রূপে স্বীকার করিবার পুরস্কার স্বরূপ সেই ভাণ্ডারে আরও কথঞ্চিৎ যুক্ত হইয়াছিল। যেহেতু ঘন-শ্যামবর্ণের সহিত মিসেস্ গুপ্তা উজ্জ্বল শুভ্র রৌপ্যখণ্ডও কিঞ্চিৎ আনিয়াছিলেন! এক্ষণে তিনি প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন এবং তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যার জননী। কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহারই নিকটে থাকিয়া St. Xaviers College এ প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এবং অন্য দুইটি বিলাতে। জ্যেষ্ঠা কন্যা এক ব্যারিষ্টারের সহধর্ম্মিণী। কিন্তু তাঁহার স্বামীর অকৃত্রিম সাহেবীআনা ও মক্কেলের যুগপৎ দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন তাঁহাকে জননীর নিকট প্রায়ই হাত

পাতিতে হয় সে জন্য তরঙ্গিনী এবার কনিষ্ঠা কন্যার জন্য একটু ধনী জামাতার অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু কন্যার সৌন্দর্য্যের তাদৃশ খ্যাতি না থাকায় তিনি বিশেষ আশা এখনও পান নাই।

তরঙ্গিনী ইঙ্গবঙ্গ সমাজে আদর্শ রমণী। পাছে সাহেবীআনায় কোনও ত্রুটি হয় এই আশঙ্কায় তিনি সদাই সন্ত্রস্ত। তাঁহার সন্তানবর্গও এইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছে; এবং সে বিষয়ে কখনও ত্রুটি ঘটিলে তাহাদের দুর্গতির অন্ত থাকে না।

সম্প্রতি কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ বা কোনও উৎসবে যাইতে হইলে তরঙ্গিনী কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যান। মেয়েটির নাম এমিলী। বেচারী জননীর শাসন ও স্নেহ—এই দুই সমস্যার মধ্যে পড়িয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছে। তাহার স্বাধীনতার লেশ মাত্র নাই। মায়ের ইচ্ছামত সে কলের ন্যায় চলা ফেরা করিয়া থাকে।

"তোমাকে দেখতে এলুম নলিনী—" এই বলিতে বলিতে সকন্যা তরঙ্গিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অনিলকে দেখিয়াই—গুড্ মর্ণিং ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী। বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন—অনিল সহাস্যে "গুড্ মর্ণিং মিসেস্ গুপ্ত। মিঃ গুপ্ত কেমন আছেন?" বলিয়া শেক হ্যাণ্ড করিল।

"Oh the naughty chap! He is after some news paper—as you know" এই কথা বলিয়া কুণ্ঠিতা কন্যার দিকে

চাহিয়া প্রচ্ছন্ন রোষ কণ্ঠে কহিলেন "Shake your hands with Dr. Chatterjee my darling—you won't soil your hands thereby—I am sure."

কন্যা যন্ত্রচালিতের ন্যায় অগ্রসর হইয়া শেক হ্যাণ্ড করিয়া গ্রামোফোনের ন্যায় বলিল "ভাল আছেন তো ?" বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সরিয়া গিয়া টেবিলে রক্ষিত একখানা পুরাতন ছবির এলবাম দেখিতে লাগিল এবং জননীর মুখভাব হইতে বর্ষণ আশঙ্কা করিয়া বোধ করি মনে মনে ভীতা হইল।

তরঙ্গিনী নলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তারপর কেমন আছ বল।

নলিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—মন্দ কি ?

এই বলিয়া সে Calling bell টিপিতে অগ্রসর হইলে তরঙ্গিনী কহিলেন, না--না, চা আনতে হবে না—এইমাত্র মিসেস্ দত্তের ওখানে খেয়ে এলুম। এমন জঘন্য চা কখনও খাইনি। তার ছোট মেয়ে সুশী তৈরী কল্লে। মেয়েটি কোনও কাজের নয়। তারপর আজ কি রকম ব্যাপার কচ্ছ বল! এমিতো আমায় দুশো বার জিজ্ঞাসা কচ্ছে আজ মিসেস্ সেনের বাড়িতে কারা আসবে মা ?

এমি ছবির এলবাম হইতে চোখ তুলিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত

লোচনে জননীর দিকে চাহিল। জননী কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। নলিনী সলজ্জ হাস্যে কহিল—না না সে রকম কিছু নয়। পার্টি বল্লে একে বাড়ান হয়। জনকতক অন্তরঙ্গ বন্ধু নিয়ে একটু আমোদ করা ছাড়া আর বেশী কিছুই নয়।

তরঙ্গিনী ঘাড় দোলাইয়া কহিলেন তাতো বটেই— সে আর আমি জানিনা? জান তো মা, এমিকে নিয়ে আমি খুব কম জায়গায় যাই। তোমার এখানে তো আর সে সব ভয় নেই! কি জানেন ডাক্তার, এমন সব ভয়ানক লোকে আজকাল বড় বড় জায়গায় ঘুরে বেড়ায় যে কুমারী মেয়েদের নিয়ে যেখানে সেখানে যাওয়া দায়।

দূরে চিত্রদর্শিনীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মিসেস্ গুপ্তার সে দিকে দেখিবার অবসর ছিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, তাই বা বলি কি করে? আমার নিজের বাড়ীতে কাজ কর্ম্মেও তো তাদের বলতে হয়? না বল্লে মহা দোষ! অথচ সবই বুঝতে পারি। বাস্তবিক, এ সব আমাদের লক্ষ্য করা দরকার হয়ে পড়েছে।

নলিনী দৃঢ়স্বরে কহিল—আমি তা দেখি মিসেস্ গুপ্তা—আমার বাড়ীর কাজে এমন কেউ আসেনা যাদের চরিত্র সমালোচনার বিষয়।

অনিল হাসিল। কহিল অমন কথা বলবেন না মিসেস সেন। তাহ'লে আমাকে তো আপনার আগেই তাড়াতে হয়। জানেন তো আমি Bachelor and in favourable terms with so many misses. সে হাসিতে লাগিল।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তরঙ্গিনী কহিলেন—না না, আমি Bachelor দের কথা বলছি না। Why there are so many husbands—কি জানেন ডাক্তার, স্ত্রীলোকের অধিকাংশকেই মন্দ বলা চলে না। কিন্তু হলে হবে কি—তারা দিন দিন একেবারে কোন ঠাসা হয়ে যাচ্ছে। তারা যে আছে একথা তাদের স্বামীরা অনেক সময় ভুলেই যায়।

অনিল কহিল, আসল কথা কি জানেন, বিবাহটা ক্রমেই পুরাণো হয়ে আসছে। বোধ করি কিছুদিন পরে আর ফ্যাসান থাকবে না। বিবাহে এখনকার স্ত্রীরা বোঝাটা সব পায় কেবল শাকের আঁটিটা ছাড়া।

মিসেস গুপ্তা হাসিয়া কহিলেন শাকের আঁটি কাকে বল্‌ছেন? স্বামীদের?

অনিল কহিল—কেন, নামটা কি আজ কালের পক্ষে মন্দ?

নলিনী কহিল, ঠাট্টা কর্চ্ছেন?

অনিল মাথা নাড়িয়া কহিল, মোটেই নয়।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে মনুষ্য জীবন যে এমন একটা গুরুতর জিনিষ, তার বিষয়ে আপনি এমন তাচ্ছিল্যভাবে কথা কইছেন কেন?

অনিল কহিল কেন? কারণ আমরা যতই গুরু গম্ভীর হয়ে কথা কই না কেন, জীবনটা তার চেয়ে ঢের গুরুতর।

এবার মিসেস্ গুপ্তা একটু বিপন্না হইলেন। কহিলেন, ডাক্তার আমরা মুখ্যু সুখ্যু লোক—আমাদের সঙ্গে একটু পরিষ্কার করে বলুন। কি বলছেন আমি তো অর্দ্ধেক বুঝতেই পারছি না।

অনিল সহাস্যে কহিল, না বোঝাই ভাল মিসেস্ গুপ্তা—আজকাল লোককে মনের ভাব বুঝতে দেওয়া মানেই ধরা পড়ে যাওয়া। আচ্ছা আসি তবে। তাহলে রাত্রিরে আসছি। কি বলেন? বলিয়া সে নলিনীর দিকে চাহিল।

সে কহিল, নিশ্চয়। কিন্তু এ রকম কৃত্রিম ভাষায় কথা বলতে পার্ব্বেন না।

অনিল পুনরায় হাসিল। কহিল, আপনি আমায় শোধরাবার চেষ্টা কর্চ্ছেন? কিন্তু লোককে শোধরাবার মত বিপদের কাজ আর কিছু নেই। কি বলেন মিসেস্ গুপ্ত? বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই—আচ্ছা আসি তাহলে। বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনিল চলিয়া যাইবামাত্র তরঙ্গিনীর মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর আকার ধারণ করিল। বার কয়েক কন্যার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, এমি, বাহিরের বারাণ্ডা থেকে মিসেস সেনের বাগান দেখলে তো মা। এমি মায়ের দিকে একবার চাহিয়াই চক্ষুনত করিয়া ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নলিনীকে নির্জ্জনে পাইয়াই তরঙ্গিনী তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে মনোযোগী হইলেন। তিনি তাহার দিকে চাহিয়া মুখখানা বিষণ্ণ করিয়া কহিলেন, এটা বড়ই দুঃখের বিষয় নলিনী!

নলিনী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। তরঙ্গিনী পুনরায় কহিলেন, সেই মাগীটার কথা বলছি। এদিকে এমন ফিটফাট হয়ে থাকে, যে আমার ভাই যতীন তো তাকে বিয়ে করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে! অথচ সত্যি কিছু এ আর হতে পারে না। সবই তো জান মা—আমার বাপ ছিলেন মস্ত সাহেব। বড় বড় সাহেব মেমের সঙ্গে তাঁর friendship ছিল—তাঁর ছেলের কিছু ওর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা কেউ ভাবতেও পারে না! কিন্তু সে কথা শোনে কে?

এদিকে নামের গোড়ায় মিসেস্‌টুকু ঠেকান আছে। দেখ একবার ঢঙ্‌টি। কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী!

নলিনী বিস্মিত ভাবে কহিল, আপনি কার কথা বলছেন?

তরঙ্গিণী বলিলেন, সরোজিনী গো!

নলিনী কহিল, সরোজিনী? আমি তো তাঁর নামও শুনিনি—কে তিনি?

তরঙ্গিনী বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলেন, সত্যি? তুমি কিছু জাননা? পরে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিতে লাগিলেন তা জান্‌বেই বা কি করে? তুমি তো বাড়ী থেকেই বেরোও—না? মিঃ গুপ্ত তোমায় বলেন Nelly is a pretty bird in its nest. কিন্তু আমরা—just the opposite. কার wife এর সঙ্গে কার husbandএর ভাব জম্‌লো—কোন মিস্ কোন husbandএর সঙ্গে চোখে কথা কইলেন—আমাদের চোখে তা কিছু এড়ায় না মা! এই ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী—সেদিন মিঃ রকুইটোর (রক্ষিত) tea-partyতে বল্‌ছিলেন—I can't conceive of any praty in Calcutta without Mrs. Gupta. বলিয়া গুপ্তা হাসিতে লাগিলেন।

জননীর বয়সী এই প্রৌঢ়ার এই নির্লজ্জ উক্তিতে তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণায় নলিনীর মন বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল—এবং বলা বাহুল্য

ঈদৃশ উৎকণ্ঠার সময় এই অকারণ পরিহাস তাহার বিশেষ চিত্তাকর্ষকও হয় নাই। সে ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠেই কহিল—কিন্তু আপনি কোন মিসেস্ দাসের কথা বলেছেন? আমাকেই বা কেন বলছেন?

মুহূর্ত্তে সেই ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের আবরণ পুনরায় তরঙ্গিনীর মুখে ফিরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন—তাই তো বল্‌ছি মা—আমরা কালও চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে বলাবলি কচ্ছিলুম যে,—মিঃ সেনের কাছে এরকম ব্যবহার আমরা কেউ আশা করিনি! তাইতেই তো বলছিলুম মা—

কিন্তু তাঁহাকে বলিতে হইল না। নলিনী বিরক্তি চাপিতে অসমর্থ হইয়া তিক্ত কণ্ঠেই বলিয়া ফেলিল—আপনাকে মিনতি কচ্ছি, সব কথা খুলে বলুন! এ রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার স্বামীর কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?

তরঙ্গিনী বিন্দুমাত্রও হঠিলেন না—বরং সপ্রতিভ ভাবেই কহিলেন—সেই কথাইতো হচ্ছে! কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? আমরা সকলেই শুধু এই কথাই ভাবছি, যে তার সঙ্গে তোমার স্বামীর কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? তোমার স্বামী রোজ তাঁর বাড়ীতে যাচ্ছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে কাটাচ্ছেন। আবার তোমার স্বামী যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ সে আর কারুর সঙ্গে দেখা করে না। অবশ্য iadyরা সে ঝাঁকে ঝাঁকে তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যায়,

তা মনে কোরো না—কিন্তু হলে কি হবে? তার পুরুষ বন্ধুর তো আর অভাব নেই। এই আমার ভাইয়ের কথাই ধরোনা! আমার তো আর কোনও কথা জান্‌তে বাকি নেই মা! আমার বোন তার বাড়ীর সামনেই থাকে কিনা? বোনঝিরা আমার সবই দেখে—কিন্তু দুটি ঠোঁট কথনও ফাঁক করে না মা! তারা সে মেয়েই নয়। হবেনা? আমার ভগ্নীপতি—

ভগ্নীপতির সংবাদে নলিনী প্রয়োজন ছিলনা—সে অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখে?

তরঙ্গিনী কহিলেন, দেখবে আর কি? তোমার স্বামী প্রায়ই তার বাড়ীতে যান। তারা দেখতে পায় কিনা! এ সব কথা অবিশ্যি তারা কয়না—তবে লোকের কাছে তোমার স্বামীর কথা বলে—এই যা! থাক্‌গে! তার জন্যে আমি ভাবিনা—কিন্তু কথা এই যে, মাগী এত পয়সা পায় কোথা থেকে? সবাই জানে, ছমাস আগে সে যখন কল্‌কাতায় আসে তখন সে প্রায় কপর্দ্দক-শূন্য—হাঁসপাতালে কাজ করে তবে পেট চালাত, কিন্তু এখন একলা সে অত বড় বাড়ীটার ভাড়া দিচ্ছে—গাড়ী-ঘোড়া রেখেছে—পোষাকও কিছু—ফ্যাসান ভাল না হলেও—মন্দ পরে না! আমাদের ভয় কি জান মা? তোমার স্বামীই এই হাতীর খোরাক যোগাচ্ছেন।

নলিনী ঘৃণাভরে একবার গুপ্তার পানে চাহিল। পরে দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি এ কথা বিশ্বাস করিনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এবার তরঙ্গিনী যথার্থই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে, মুখের উপর এরূপ নির্ভীক উত্তর দিতে, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও বোধ করি ইতস্ততঃ করিতেন। কিন্তু এই মেয়েটির মুখে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, যে বিশ্বাসের অটল দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া মিসেস্ গুপ্ত স্তম্ভিত হইলেন—কিন্তু দমিলেন না। বরং তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়াই কহিলেন, কিন্তু কল্‌কাতা শুদ্ধ লোক এ কথা জানে।

নলিনী ঈষৎ হাসিল—স্নিগ্ধ সরল হাসি। পরে কহিল, বিশ্বশুদ্ধ লোক যদি এ কথা বলে, তাহলে আমি বিশ্বশুদ্ধ লোককে বলি, এ তোমাদের মিথ্যা কথা।

এবার তরঙ্গিনী দমিলেন—কিন্তু তথাপি থামিলেন না। সুর বদলাইলেন মাত্র। তিনি আত্মীয়তার ভাণ করিয়া কহিলেন, কি জান মা, তুমিই বল, বা সত্যেনই বল—তোমরা দুজনেই আমাদের স্নেহের পাত্র। মানুষের স্বভাব জান্‌তে তোমাদের এখনও অনেক দেরী। বিশেষ পুরুষ জাত—বেশী কথা আর ব'লব কি মা, এই ২৭ বৎসর হল আমার বিয়ে হয়েছে—এখনও আমি মিঃ গুপ্তকে চিন্‌তে পারলুম না। তোমার কাছে বলতে বাধা নেই—সাহেবের কোনও বেচাল দেখ্‌লে, আমি রোগের ভাণ করে—

সাহেবকে নিয়ে কল্‌কাতা থেকে সরে পড়ি। এজন্যে যে আমায় কত পাড়াগাঁয়ের ধুলো আর সেই পেঁকো জল খেতে হয়েছে, তা আর কি বলব। তবুও সত্যি কথা বলতে কি, পয়সা কড়ি সে বড় একটা কাউকে কখনও দেয় না—সেদিকে ঠিক থাকে। তা তোমার তো এই ক'দিন মাত্র বিয়ে হয়েছে!

তরঙ্গিনীর কথায় নলিনী মনে মনে হাসিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সব পুরুষই কি এই রকম?

তরঙ্গিনী উৎসাহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—ও সব মা সব —একটিও ভাল নয়। আর তা'রা কখনও শোধরায় না। বয়স হলে তারা বুড়ো হয়। কিন্তু ভাল হয় না! এই তোমাদের 'গুপ্তর কথাই ধর' না—আমার বাবা ছিলেন মস্ত সাহেব। আর গুপ্তও সাহেবী কেতায় দুরস্ত ছিল। সুতরাং আমাদের রীতিমত কোর্টশিপ্ করেই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে হবার আগে, সাহেব দিনে ৫৭ বার করে আত্মহত্যাই কর্ত্ত। শেষে নাছোড়বান্দা দেখে আমি তো স্বীকার হলুম। বিয়েও হয়ে গেল। মোদ্দা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, আমাদের বড় ছেলের নেপালী গবর্ণেসটাকে নিয়ে—দেখে-শুনে ছুঁড়ীটাকে আমার বড় বোনের কাছে দিলুম—ভাবলুম আমার ভগ্নীপতি দত্ত বুড়োমানুষ—সেখানে আর কোনও ভয় নেই। My God, তিন মাস পেরুল না—আমার বোন তাকে ট্রেণভাড়া দিয়ে, আর আমায় গালাগালি দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলে।

যাক্ আমি উঠলুম—কিন্তু যা বল্লুম—সেনকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়। কিছুদিন দুজনে বাইরে কাটিয়ে এস। বাস্, সব চুকে যাবে। তোমার স্বামী আবার তোমারই হবে।

এই শেষ কথাটা সূচ্যগ্রের ন্যায় নলিনীর কর্ণে বিঁধিল। তাহার বুকটা ছাৎ করিয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল, এই প্রৌঢ়াকে তাড়াইয়া দেয়। সে কি তাহার স্বামীকে হারাইয়াছে—যে ফিরিয়া পাইতে হইবে? তথাপি শুষ্ক ভদ্রতার খাতিরে মুখে কহিল, আবার আমারই হবেন?

গুপ্তা সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, হাঁ মা। এই নষ্ট মাগীগুলো আমাদের Husbandদের কেড়ে নেয়—কিন্তু তারা আবার ফিরে আসে। আর না এসেই বা করে কি?

বলিয়া তরঙ্গিনী উঠিলেন—কিন্তু গেলেন না। দেওয়াল-সংলগ্ন সুবৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলটা ঠিক করিয়া লইতে লইতে কহিলেন—হ্যাঁ, আর এক কথা। এ নিয়ে যেন কাঁদাকাটা বা হট্টগোল কিছু কোরোনা। পুরুষেরা সে সব পছন্দ করে না।

নলিনীর রজতশুভ্র মনটিতে সন্দেহের এই কৃষ্ণরেখাপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন ভাবিয়া, মিসেস গুপ্ত বোধ করি মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, যে পুরুষ-চরিত্র তাঁহার নখদর্পণে। এমনই বিজ্ঞের ন্যায় তিনি কথা কহিতেছিলেন। চুল ঠিক করিয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ডাকিলেন "এমি!"

নলিনী ও জননীর কথাবার্ত্তা তাহার শ্রোতব্য নহে জানিয়া বারাণ্ডার কোণে সে এতক্ষণ ম্লান চক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। মাতার আহ্বানে ধীরপদে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জননী কহিলেন, চল। তারপর পুনরায় নলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হাঁ, ভাল কথা আজ তুমি মিঃ সরকারকে বলেছ শুনে বড় খুসী হলুম। তার বাপ পাটের দালালীতে অনেক টাকা করেছিল। ওই এক ছেলে। যদিও দেখতে তেমন সুপুরুষ নয় তাহলেও এদিকে বেশ। আমার এমিকে বড় পছন্দ। অবিশ্যি এখনও কিছু ঠিক করিনি— দেখি কি হয়!

এমি লজ্জায় মুখ নত করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়াছিল— মাতার আহ্বানে যেন বাঁচিয়া গিয়া দ্রুতপদেই মিসেস গুপ্তের আগে আগে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নলিনী সেনের সরল হৃদিক্ষেত্রে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়া তরঙ্গিনী প্রস্থান করিলেন—এতক্ষণে তাহার প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। সন্দেহের ঈষৎ মলিন রেখাপাত কখন যে ঘনকৃষ্ণ অঙ্কে পরিণত হইল—তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। গুপ্তা প্রস্থান করিলে পর নলিনী স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। নীচে রঘুনাথজী দরওয়ানের সহিত ক্রীড়ায়মান শিশুপুত্রের কলকণ্ঠ ভাসিয়া আসিতেছিল। শুনিয়া তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। এই দুশ্চিন্তাকে সে সবলে হৃদয় হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু ততক্ষণে সে বিষবৃক্ষের মূল তাহার চিত্তে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া বসিয়াছে। কি ভয়ানক! এতক্ষণে সে অনিলের উল্লিখিত হতভাগ্য দম্পতীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিল। তবে কি—না—অসম্ভব। এইমাত্র তরঙ্গিনী তাহাকে বলিয়া গেলেন, তাহার স্বামী সেই রমণীকে মুক্ত হস্তে অর্থ দেন। মিথ্যা কথা! তাহার স্বামীর হিসাবের বই তো ঐ টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে, তাহারই এক্তিয়ারে থাকে। একটা চাবিও কখন দেওয়া হয় না। ইচ্ছা করিলে সেত এখনই উহা দেখিতে পারে!

ভাবিতে ভাবিতে সে অজ্ঞাতে সেই টেবিলটার পানে অগ্রসর হইল। পরক্ষণেই বিবেকের দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

জন্ম তিথি

ছি, ছি, স্বামীকে সন্দেহ? তাহার স্বামীর ন্যায় স্নেহময় পত্নীবৎসল স্বামী—কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! যদি মন তাঁহার তাহার প্রতি বিমুখ হইত, তবে সে কি তাহা বুঝিতে পারিত না? কাল সন্ধ্যাকালে তাহার মাথা ধরিয়াছিল—তাহার স্বামী রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহার পার্শ্বে বসিয়া পরিহাস সরল কণ্ঠে কত না গল্প করিয়াছিলেন—তাহাকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য। সে শুনিতে পাইয়াছিল—রাত্রে তিনি পুত্রের আয়াকে উপদেশ দিতেছিলেন—ছেলে কাঁদিলে সে যেন তাহাকে তাঁহার কক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। কোনও কারণে রাত্রের মধ্যে যেন তাহাকে বিরক্ত করা না হয়। তারপর তাহাকে নিদ্রাতুর দেখিয়া যখন তিনি নিজের ঘরে উঠিয়া যান—তখন তাহার নিদ্রালস চক্ষুর উপরে তাঁহার ওষ্ঠের স্পর্শ—তেমনই প্রেমচঞ্চল—তেমনই উষ্ণ! তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের নিদর্শন—হীরকবলয় জোড়াটা এখনও তাহারই সম্মুখেই রহিয়াছে। এমন স্বামীকে সন্দেহ? গুপ্তার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল তাহার স্বামীর হিসাবের খাতাখানা আজ সন্ধ্যায় যখন তরঙ্গিনী আসিবেন—তাঁহাকে দেখাইয়া প্রমাণ করে যে, তাহার স্বামী নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে অজ্ঞাতে টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া, দেরাজ খুলিয়া খাতাখানা বাহির করিয়া উল্টাইতে লাগিল। না—মিসেস দাস—এ নামের উল্লেখও কোথাও নাই।

জন্ম তিথি

কিন্তু ওকি ? একখানা বড় খামের মধ্যে একখানা খাতা, খামখানার উপরে লেখা—confidential. কম্পিত হস্তে খামখানা খুলিয়া নলিনী দেখিল, খাতাখানা তাহার স্বামীর নিজস্ব হিসাব। প্রথম পত্র উল্টাইয়াই দেখিল, ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্‌দাস—৬০০৲। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। যন্ত্রচালিতের ন্যায় পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিল, কেতায় কেতায়, কখনও ২০০৲, কখন ৩০৲ মিসেস্ দাসের নামে খরচ লেখা হইয়াছে। তাহার চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিল—বিশ্বসংসার যেন পদতলে লুপ্ত হইয়া গেল !

ছলনা—ছলনা ! এই দীর্ঘ দুই বৎসরব্যাপি প্রেমাভিনয়—সমস্ত ছলনা—সব প্রবঞ্চনা ! স্বামীর সহস্র আদরের অন্তরালে নিষ্ঠুর ছলনা— নীচ বিশ্বাসঘাতকতা। সহস্র প্রণয় চুম্বনের অন্তরালে—নির্লজ্জ ব্যভিচার। আশ্চর্য্য ! অথচ একদিনের তরেও সে বুঝিতে পারে নাই। এমনই সুদক্ষ চাতুর্য্যের সহিত তাহার স্বামী তাহার চক্ষে নিজেকে সাচ্চা বলিয়া চালাইয়া আসিয়াছে। এত বড় পাপ-কলুষ হৃদয় লইয়া নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা কহিয়া আসিয়াছে ! সে তাহার স্বামী। তাহার সন্তানের পিতা !

জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাহার পিসিমার শিক্ষার কথা মনে পড়িল। গভীর রাত্রে—স্তিমিতালোক গৃহের শয্যাপ্রান্তে শায়িতা

বালিকার প্রতি প্রৌঢ়ার সেই শিক্ষা। "স্বামীর কখনও দোষ ধরো না মা, তিনি যতই কেন অন্যায় করুন না। ছেলের যেমন বাপের দোষগুণ বিচার কর্বার অধিকার নেই—স্ত্রীরও তেমনি স্বামীর দোষগুণ বিচার কর্বার অধিকার নেই।" তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—তোমার স্বামী যদি এমন হয়, তবে তুমি কি কর?

সিঁড়িতে সত্যেন্দ্রের জুতার শব্দ ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নলিনী—খাতাখানা ঘৃণাভরে মেজের ফেলিয়া দিয়া—একখানা সোফার পশ্চাদংশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া, স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বালাজোড়া দিয়ে গেছে নলিনী ?—এই কথা বলিতে বলিতে সত্যেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল এবং স্ত্রীর চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরক্ষণেই মার্ব্বেলের মেজের উপর তাহার হিসাবের খাতাখানি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, ব্যাপারটা কতক হৃদয়ঙ্গম করিয়া খাতাখানা কুড়াইয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, তুমি আমার হিসাবের খাতাখানা দেখেছ দেখছি ! এর উপরে Confidential লেখা রয়েছে ! তা স্বত্বেও এখানা খোলা তোমার উচিত হয় নি !

তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বরে নলিনী উত্তর করিল, কেন ঐ খাতাখানা তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে বলে ?

নলিনীর কণ্ঠে এই শ্লেষ এবং এই ভাষা—সত্যেন্দ্র জীবনে এই প্রথম শুনিল। সে ধীর স্বরে কহিল—না। কিন্তু নলিনী, তুমিই না বল যে স্বামীর কার্য্যে সন্দেহ কর্ব্বার স্ত্রীর অধিকার নেই ?

নলিনী তিক্ত কণ্ঠে কহিল—সন্দেহ ? আমি আধঘণ্টা আগে এই সরোজিনীর অস্তিত্বও জানতেম না।

সত্যেন্দ্র ঈষৎ ভৎসনার স্বরে বলিল, ছি ছি নলিনী—মিসেস্ দাসের সম্বন্ধে এই রকম ভাষায় কথা বলা তোমার উচিত হচ্ছে ?

কিন্তু গুপ্তা-রোপিত বিষবৃক্ষের বীজ তখন নলিনীর হৃদয়ে পত্রপুষ্পে মুঞ্জরিত হইয়া তীব্র হলাহল উদ্‌গীরণ করিতেছিল। ভৎসনার' এই সহানুভূতির সান্ত্বনা তাহার হৃদয়-দ্বার হইতে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, ভারি দরদ দেখছি!

কিন্তু পরক্ষণেই—নিজের ক্রোধের এই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং অসংগত উচ্ছ্বাস-বোধ করি নলিনীর নিজের কণ্ঠেও বিসদৃশ মনে হইল। যখন সে পুনরায় কথা কহিল, তখন অভিমান তাহার ক্রোধের স্থান অধিকার করিয়াছে। সে স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টস্বরে কহিল, দেখ, মনে করনা যে আমি ছাই টাকার জন্যে এ কথা বল্‌ছি। আমাদের যা কিছু আছে তুমি দু'হাতে নষ্ট কর্‌লেও আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু তুমি আমার ভালবাসার—সে আর বলিতে পারিল না। উভয় হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া সোফার উপরে বসিয়া পড়িল।

সত্যেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকিয়া পরে নিকটে আসিয়া তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিয়া নীরব ভাষায় তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা তাহার মস্তক সরাইয়া লইয়া নলিনী মুখ তুলিয়া কহিল, ছি ছি, আমার যে লজ্জা হচ্চে—তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?

জন্ম তিথি

সত্যেন্দ্রের প্রশান্ত সুন্দর মুখে ঈষৎ হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ধীর শান্ত স্বরে কহিল—নলিনী, বিশ্বাস কর—তোমাকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাকেও আমি ভালবাসি না।

স্বামীর এই সরল নির্ভীক উক্তি যেন নলিনীর মনের সন্দেহের মূল দেশটা সবেগে নাড়িয়া দিল। সে আবিষ্টের ন্যায় কহিল, তবে এই সরোজিনী কে? তুমি এর জন্যে বাড়ীভাড়া করেছ কেন?

পুনরায় ঈষৎ হাস্য সহকারে সত্যেন্দ্র কহিল, আমি মিসেস্ দাসের জন্যে বাড়ীভাড়া করিনি।

নলিনী কহিল, কিন্তু তোমার পয়সায়ই সে বাড়ীভাড়া করেছে।

সত্যেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া লইয়া কহিল—নলিনী, মিসেস্ দাসের সম্বন্ধে আমি যতটুকু জেনেছি—তাতে—

সত্যেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া নলিনী কহিল, কিন্তু সত্যি মিসেস্ দাস—না লোককে ভুলাবার জন্যে একজন মিঃ দাসকে খাড়া করা হয়েছে?

সত্যেন্দ্র সরল ভাবে ব'লল—না। মিঃ দাস যথার্থই অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন।

পরে বোধ করি স্বভাবকরুণ নলিনীর হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, এখন তাঁর কেউ নেই।

কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। নলিনী সন্দেহের স্বরে বলিল, কেউ নেই?

সত্যেন্দ্র কহিল, না।

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে নলিনী কহিল, বিচিত্র!

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া সত্যেন্দ্র কহিল, শোন নলিনী, আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি আমি মিসেস দাসের কোনও রকম বেচাল দেখিনি! তবে যদি—বহুদিন আগে—

নলিনী অধীরভাবে বলিল, থাম। আমি তার পূর্ব্ব ইতিহাস জানবার জন্যে এতটুকুও ব্যস্ত নই।

ঈষৎ হাসিয়া সত্যেন্দ্র কহিল, তার অতীত কাহিনী আমি তোমাকে শোনাচ্ছি না নলিনী। আমি শুধু তোমায় বোঝাতে চাই—যে এই মিসেস্ দাসই একদিন যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রীই ছিলেন। কিন্তু সে সম্মান দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি হারিয়েছেন—বা ত্যাগ করেছেন একথাও বলতে পার। কিন্তু সেইটুকুই তো এর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণ—সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী! অদৃষ্টের প্রহার সহ্য হয়—কারণ তারা বাইরে থেকে এসে আমাদের আক্রমণ করে। কিন্তু নিজের দোষে কষ্ট পাওয়ার মত মর্ম্মান্তিক দুঃখ—একটি ভুলে সারাজীবনটা একটা বোঝার মত টেনে বেড়ান'র চেয়ে দুঃখ—আর কিছু কল্পনা কর্ত্তে পারা যায় কি?

ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া নলিনী বলিল, কিন্তু এসব কথা আমার সঙ্গে বলবার দরকার কি?

সত্যেন্দ্র কহিল, দরকার আছে! বিশ বছর. আগে এই মিসেস্ দাস তোমারই মত স্ত্রী ছিলেন—তাঁরও স্বামী ছিলেন।

নলিনী বিরক্তভাবে বলিল, সে সব কথা আমি জান্‌তে চাইনা! তুমি আমায় অনেক রকমেই কলঙ্কিত করেছ। তার নামের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারণ করে সে কলঙ্ক আর বাড়িও না।

সত্যেন্দ্র ধীরভাবে উত্তর করিল, নলিনী, তুমি তাঁকে রক্ষা কর্ত্তে পার। তিনি আবার সমাজের দুয়ারে আশ্রয়প্রার্থিনী হয়ে দাঁড়িয়েছেন! কিন্তু যে সমাজ ব্যভিচারি পুরুষের সগর্ব আস্ফালনের সম্মুখে সভয়ে কাঁপে, এই ভ্রান্ত নারীর মিনতি ভিক্ষা—সে রক্তচক্ষে উপেক্ষা কর্চ্ছে। তুমি তাকে বাঁচাতে পার।

নলিনী সবিস্ময়ে কহিল, আমি?

সত্যেন্দ্র স্থিরস্বরে বলিল হাঁ, তুমি।

নলিনী অন্তরের ঘৃণা সম্পূর্ণ গোপন করিতে অক্ষম হইয়া বলিয়া ফেলিল, তুমি কোন সাহসে আমার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছ?

সত্যেন্দ্র বিচলিত হইল না। কহিল, নলিনী, আমি তাঁ হয়ে তোমার কাছে একটি অনুরোধ কর্ত্তে এসেছি। তার আ

আমি এইটুকু বলতে চাই—যে আমি তাঁকে যথার্থই টাকা দিয়েছি—আর তুমি যে তা জানো বা জান্‌তে পার—এও আমার ইচ্ছা ছিল না। যদি আজ এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার না ঘটতো, তাহলেও এই অনুরোধই আমি তাঁর হয়ে তোমাকে কর্ত্তাম। আর তা'হলে তোমার মত করুণাময়ী সরলা যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান কর্ত্ত না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

নলিনী অধীরভাবে বলিল, ভণিতা রাখ। কি বলতে চাও বল!

সত্যেন্দ্র সহজভাবে কহিল, আজ রাত্রে তুমি তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ কর।

নলিনীর ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, তোমার মাথার ঠিক নেই।

সত্যেন্দ্র অনুনয় করিয়া বলিল, আমি মিনতি কর্চ্ছি। লোকে তাঁর নামে নানা কথা বল্‌তে পারে—আর বলেও। কিন্তু কেহই তার বিরুদ্ধে নিশ্চিত করে কিছু বল্‌তে পারে না—নিশ্চিত কিছু জানে না। তিনি এখানে অনেক ভদ্রগৃহে গেছেন। অবশ্য স্বীকার করি, যে নাম শুনলে তুমি হয়তো সে সব যায়গায় যেতে চাইবে না—কিন্তু এই সব স্থান এখন সম্ভ্রান্ত গৃহ বলেই সমাজে চলে যাচ্চে। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি একবার তোমার গৃহে অতিথি হ'তে চান।

নলিনীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে হিংস্র দৃষ্টিতে স্বামার পানে চাহিয়া কহিল, কেন, নৈলে তাঁর জয় সম্পূর্ণ হচ্ছে না?

কিন্তু বোধ করি এই তরুণ ব্যারিষ্টারটির মনে কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকিবে। সে এই আঘাতও বিনা আপত্তিতে সহ্য করিয়া বলিল—তার জন্য নয় নলিনী—তিনি জানেন যে তুমি যথার্থই সতী। তাঁর বিশ্বাস—তিনি যদি একবার তোমার গৃহে অতিথি হতে পারেন—তবে সমাজ নিঃসংশয়ে তাঁকে আবার গ্রহণ কর্ব্বে। যদি তোমার দ্বারা একজনের জীবন আবার মধুময় হয়—তুমি তা কর্ব্বে না?

নলিনী স্থির স্বরে কহিল, না। যে যথার্থ অনুতপ্ত, সে আমার গৃহে না এসেও ভাল হতে পারে।

সত্যেন্দ্র কহিল, আমি তোমার কাছে তাঁর হয়ে এই ভিক্ষা চাইছি।

নলিনী বলিল, আমি তা দেব না। মিষ্টার সেন, তুমি কি মনে কর—যে আমার বাপ-মা কেউ নেই বলে তুমি আমার সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার কর্ব্বে? ভুল! তোমার ভুল। আমারও বন্ধু আছে!

নলিনীর মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল—যাহা দেখিলে মনে হয়—এ মানুষটার পক্ষে অসম্ভব কার্য্য এক্ষণে কিছুই নাই।

সত্যেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিল। সে সমানুভূতি দেখাইয়া কহিল, নলিনী তুমি ছেলেমানুষী কর্চ্ছ। কিন্তু যাই হোক, আমি তোমায় আবার অনুরোধ কর্চ্ছি—তুমি আজ—এই এক রাত্রের জন্য —মিসেস্ দাসকে তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কর।

নলিনী নিষ্ঠুরভাবে বলিল, আমিও তোমায় আবার বল্‌ছি, আমি তা কর্ব্ব না।

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কর্ব্বে না?

নলিনী কহিল, না।

সত্যেন্দ্র পুনরায় মিনতি করিয়া সস্নেহে বলিল, আমার কথা রাখ নলিনী, বিশ্বাস কর; তাঁর—

নলিনী উপেক্ষাভরে কহিল, আমার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই।

সত্যেন্দ্র হতাশার সহিত কহিল—সাধ্বী স্ত্রী এত নিষ্ঠুর হয়!

নলিনী নৃশংস ভাবে বলিল, হাঁ। আর দুশ্চরিত্র পুরুষেরা এমনই দুর্ব্বলচেতা হয়।

সত্যেন্দ্র আহত হইল। সে ম্লান মুখে বলিল, নলিনী, তুমি কি আমায় চরিত্রহীন বলে মনে কর?

এত রাগের মুখেও এ কথার উত্তরে নির্ভীক 'হাঁ' বলিতে—বোধ করি নলিনীর মুখেও বাধিল। সে কথাটা ঘুরাইয়া বলিল, আমি শুনেছি পুরুষমাত্রেই চরিত্রহীন।

ধন্য তরঙ্গিনী শিক্ষা !!

কিন্তু সত্যেন্দ্র স্পষ্ট উত্তর চাহিল। বলিল, কিন্তু আমি ?

পরাজিত হইলেও স্বীকার না করিয়া নলিনী বলিল, সে আমি জানি না।

সত্যেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি জান। কিন্তু এই আধ ঘণ্টায় আমাদের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। আর তা বাড়িওনা। ঠাণ্ডা হয়ে বসে ঐ কার্ডখানায় তাঁর নামটা লিখে দাও দেখি! সত্যেন্দ্রের কণ্ঠ সহজ।

নলিনী বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, তুমি আমায় বাধ্য কর্তে চাও? আমি কিছুতেই তা লিখব না।

সত্যেন্দ্র কহিল, তাহলে আমাকেই লিখতে হবে।

সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। টেবিলের কাছে বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একখানা কার্ড বাহির করিয়া লিখিতে লাগিল।

নলিনী রুদ্ধরোষে কিয়ৎকাল স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিয়া, স্থিরস্বরে বলিল, যদি সে আজ আসে—তাহলে আমি তাকে অপমান কর্ব্ব।

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়া পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার-রুদ্ধ করিয়া দিল। সত্যেন্দ্র স্ত্রীর গতিপথের পানে চাহিয়া

কলম হস্তে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার সুগৌর সুন্দর মুখমণ্ডল সহানুভূতি ও সমবেদনার স্পর্শে ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও—সে মুখে ক্রোধ বা বিরক্তির ছায়া মাত্রও বোধ করি কেহ বাহির করিতে পারিত না।

নবম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাকাল। সেন-গৃহের মুক্ত-বাতায়ন কক্ষগুলি হইতে বিদ্যুতালোক বিকীর্ণ হইতেছিল। সত্যেন্দ্র নীচে গাড়ী বারাণ্ডার নিম্নস্থ সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া মোটর ও অশ্বযানবাহিত অতিথি মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইতেছিল। নলিনী উপরে ড্রয়িং রুমের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মধুর ভাষণে তাঁহাদের আপ্যায়িত করিতেছিল। ড্রয়িংরুমে ভিন্ন ভিন্ন আসনে "ডে—রে—মিটার" ইত্যাদি অভ্যাগতের দল হাস্যতামাসা করিতেছিলেন। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির সহিত মিসেস্ গুপ্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া সেন পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা সপ্রমাণ করিতে ছিলেন ও ঘন ঘন দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন। মিসেস্ গুপ্তার বিশেষ ইচ্ছা স্বত্ত্বেও, পুরুষ অতিথিদলে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া এমি গুপ্তা তাহার মাসির সঙ্গে কথা কহিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে মিঃ সরকার দ্বারপ্রান্তে দেখা দিবামাত্র মিসেস্ গুপ্তা নিমেষে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। নলিনীকে পার হইয়া সরকার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তরঙ্গিনীর সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া এমিকে দেখিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তরঙ্গিনী ছাড়িলেন না।

Hallo young man! So you are here at last! So surprising and so unexpected—"এই বলিয়া কেতা-দুরস্ত হাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে দাঁড় করাইলেন। সরকার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, হ্যাঁ—গোটাকতক Engajement Cancel কর্ত্তে হয়েছে বটে।

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া তরঙ্গিনী কহিলেন—সে আর আমি জানিনা? your time is as valuable to you as a precious pearl to us. It means a lot of money, I Know—বলিয়া নিকটস্থ অতিথিবর্গের পানে চাহিলেন—ইচ্ছাটা তাঁহার ভাবী জামাতা কিরূপ অর্থশালী তাহা একবার সকলে শুনিয়া লউক। কিন্তু যাঁহারা গুপ্তা-সরকার আলাপের সময় কাণ খাড়া করিয়া প্রত্যেক অক্ষরটি পর্য্যন্ত সন্তর্পণে শুনিতেছিলেন—তরঙ্গিনী তাঁহাদের প্রতি চাহিবামাত্রই তাঁহারা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

মিঃ সরকার সবিনয়ে হাসিয়া এমির দিকে অগ্রসর হইলেন। এবং হাত ধরিয়া সলজ্জা এমিকে লইয়া পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত জন-বিরল কক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন।

নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের দল প্রায় সকলেই উপস্থিত—সুতরাং

জন্ম তিথি

সত্যেন্দ্রের আর নীচে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিলনা। তরঙ্গিনীর সহোদর মিঃ যতীন চৌধুরীর সহিত কথা কহিতে কহিতে উপরে উঠিতেছিল। চৌধুরী মিসেস্ গুপ্তার জ্যেষ্ঠ বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। মস্তকের মধ্যস্থলে চক্রাকারে টাক; সেই টাকবিশিষ্ট মস্তকের অবশিষ্ট কেশ কয়গাছি ডানদিকে দুই ভাগে হইয়াছে। টাকের সম্মুখের ও পশ্চাদভাগের কিয়দংশ চুল বক্র— যেন দুইটি শাখা নদী সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। অর্থাৎ বর্ণ শ্যাম—কিন্তু cream ইত্যাদি বিদেশী ভৈষজ্যপ্রয়োগে উজ্জ্বল—মৃণ্ময় দেবীপ্রতিমা তৈল বিশেষে যেমন উজ্জ্বল হইয়া থাকে। জনৈকা ইউরেসিয়ান রমণীকে বিবাহ করিয়া এবং পরে আইনের সাহায্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইনি ইং-বঙ্গ সমাজে 'স্বনামো পুরুষো ধন্য' হইয়াছিলেন। সে প্রায় ২০ বৎসরের কথা। গুম্ফ-দাড়ী ইত্যাদি বর্জ্জিত মুখখান নিতান্ত কুৎসিত নহে। পীতবর্ণের প্যাণ্ট ও কোটে তাঁহার খর্ব্ব ও স্থূল দেহখানি আবৃত। সত্যেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছিতে ছিলেন। সত্যেন্দ্রের চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ সবল গৌরবর্ণ দেহের পার্শ্বে তাঁহাকে আরও খর্ব্ব দেখাইতে ছিল। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর চৌধুরী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—তারপর সরোজিনীর কোনও ঠিকানা বার কর্ত্তে পার্লে?

এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া সত্যেন্দ্র কহিল—কেন তাঁর ঠিকানা আপনি ত জানেন?

—By jove, আমি সেকথা বল্‌ছি না। সে কে? কোথা থেকে এল? কেনই বা তার কেউ নেই? অবিশ্যি আত্মীয় থেকে যে বিশেষ উপকার হয় তা নয়—কিন্তু it adds to the respectability.

—সত্যেন্দ্র নীরব রহিল।

আমি তো determined—I will marry her. I don't care about these demmed relations. বিয়ে তাকে আমি কর্ব্বই—তবে বিয়ের আগে সে সমাজে একটু চলে গেলে মন্দ হ'ত না। তুমি তো অনেক বিষয়ে তাকে সাহায্য কর্চ্ছ—এ দিকে কিছু কর্ত্তে পার না?

সত্যেন্দ্র নীরস স্বরে কহিল, মিসেস্ দাস আজ এখানে আসবেন।

চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চৌধুরী কহিল, তোমার wife তাকে কার্ড পাঠিয়েছেন?

সত্যেন্দ্র কথাটা ঘুরাইয়া বলিল—মিসেস্ দাস কার্ড পেয়েছেন।

আনন্দের উচ্ছ্বাস চাপিতে অসমর্থ হইয়া চৌধুরী কহিলেন, I am so glad.

ঠিক এই সময় নলিনী সেইখান দিয়া যাইতেছিল। চৌধুরীকে

জন্ম তিথি

পশ্চাৎ রাখিয়া সত্যেন্দ্র সেইদিকে অগ্রসর হইয়া কহিল,—নলিনী, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি আসছি—বলিয়া সত্যেন্দ্রের পানে না চাহিয়াই নলিনী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

নলিনীর এই স্পষ্ট উপেক্ষায় সত্যেন্দ্রের প্রশান্ত সুন্দর মুখমণ্ডলে যে বিষাদের ম্লান রেখাটি ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি-ব্যঞ্জক সুবৃহৎ সুদর্শন চক্ষুদ্বয়ে যে সজল করুণার ভাবটি ফুটিয়া উঠিল—সেই তীক্ষ্ণ বিদ্যুতালোকে তাহা বোধ করি নিমন্ত্রিতবর্গের লক্ষ্যেরই বিষয় হইয়া দাঁড়াইত--যদি না ঠিক সেই সময় মিঃ ব্যানার্জ্জির পরিহাস-সরল কণ্ঠস্বর তাহার কানে পৌঁছিত। এই সুশীল ব্যানার্জিকে সত্যেন্দ্র যথেষ্ট স্নেহ করিত। এখানে বি,এ পাশ করিবার পর বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া সে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকৃটিস করে। মাসে একটা কেসেও সে আদালতে দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না। তাহার পিতার অনেক টাকা আছে—তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। সে প্রত্যহ মোটরে চড়িয়া হাইকোর্টে যায়, দাবা খেলে, এবং দ্বিপ্রহরে যাহা ভক্ষণ দ্বারা টিফিন কার্য্য সমাধা করে --তাহার নাম আমি উচ্চারণ করিলাম না। কিন্তু ছেলেটি সরলচেতা এবং সচ্চরিত্র। লোককে হাসাইবার ক্ষমতা তাহার আছে। সে আজও অবিবাহিত।

জন্ম তিথি

গুড্ ইভ্নিং মিঃ সেন—আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলেন না? আমি কেমন আছি যদি কেউ জিজ্ঞাসা না করে—তাহলে sir, আমি 'মনে মনে ভারি চটি' you know বলিতে বলিতে বলিতে সে সত্যেন্দ্রের সহিত শেকহ্যাণ্ড করিল। সত্যেন্দ্র কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে চৌধুরীকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, গুড্ ইভ্নিং মিঃ চৌধুরী! আপনার নাকি আবার বিয়ে হচ্ছে? আমি তো মনে করছিলুম you are tired of the game.

চৌধুরী নিম্নস্বরে তাহার হাতটা নাড়িয়া দিয়া কহিলেন—আঃ কি ছেলেমানুষী কর?

কিন্তু সুশীল ছেলেমানুষী ছাড়িল না। কহিল—আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আপনি দুবার বিয়ে করে একবার ডাইভোর্স্‌ড হয়েছেন—না একবার বিয়ে-করে দু'বার divorced হয়েছেন? কোনটা ঠিক বলুন তো? আমার তো বোধ হয় শেষেরটাই সম্ভব—কি বলেন?

চৌধুরী—আমার মনে নেই—এই বলিয়া মুখ খানা ভার করিয়া প্রস্থান করিল। সত্যেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। হাস্য পরিহাসে তাহার হৃদয়ের মেঘ কখন যে চাপা পড়িয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সে সুশীলের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

জন্ম তিথি

স্বামীকে পার হইয়া নলিনী একেবারে গাড়ী বারাণ্ডায় মুক্ত গগণতলে আসিয়া দাঁড়াইল। অনতিশীতল নৈশ-সমীরণ তাহার গৃহসংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষের উপর দিয়া মর্ম্মর শব্দে বহিয়া যাইতেছিল—নীচে হইতে হাসনাহানার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম ভাগে সম্পূর্ণপ্রায় চন্দ্র আকাশ হইতে সুমিষ্ট কিরণধারা বর্ষণ করিতেছিল। গৃহমধ্যস্থ কৃত্রিমতা হইতে বাহিরে আসিয়া সে যেন প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় পাইল! সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে, কুসুম-সুবাসিত সমীরণস্পর্শে, কি জানি কি ভাবিয়া তাহার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া আসিল। সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাড়ী বারান্দার একটা থামের গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। নিজের দুঃখে সে তখন এতই বিভোর, যে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী কখন যে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহা সে জানিতেও পারে নাই। প্রায় নলিনীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ হইতে ভিন্ন দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ তাহার পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ রুমালে নিজের চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া বলিল, মিসেস্ সেন, আপনি কাঁদছেন?

ডাক্তারের কণ্ঠস্বর আন্তরিক সহানুভূতি স্পর্শে কোমল-করুণ। সেই স্বরে নলিনীর অশ্রুবেগ বর্দ্ধিত হইল। সে কহিল, আপনিও আমায় কোনও কথা বলেন নি! আপনিও—সে

আর বলিতে পারিল না। দুই চক্ষু রুমালে আবৃত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

এই রোরুদ্যমানা মেয়েটির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অনিলের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার অশ্রুসজল কণ্ঠের একান্ত নির্ভরশীল বাণী শুনিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এই যুবতী যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহাকেই নির্ভর করিয়া ছিল। আজ সে তাহার হৃদয়দ্বার মুক্ত করিয়া দিল মাত্র। তাহার ইচ্ছা হইল নলিনীর বর্ষণশ্রান্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, অশ্রুসিক্ত চক্ষুর্দ্বয়ের উপর চুম্বন করিয়া, সর্পদষ্ট ব্যক্তির আহত স্থান হইতে যেমন করিয়া বিষ চুষিয়া লইয়া রোগীকে বিষমুক্ত করে—সেইরূপ তাহার সমস্ত দুঃখ নিজে বরণ করিয়া লয়। তাহার মনের নিভৃততম অংশে সযত্নরক্ষিতা মূক দেবী—তাহার নিষ্ঠুর মানস প্রতিমা—কর্ত্তব্য নিষ্ঠা হৃদয়ের রাণী—যাহার নিকট হইতে সে কখনও একটা সান্ত্বনার বাক্য ও আশা করে নাই—আজ সে তাহাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়—একমাত্র নির্ভরস্থল জানিয়াছে—স্বীকার করিয়াছে। তাহার মনের মধ্যে সেই মুহূর্ত্তেই যেন দৈত্য দানবের যুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর আতঙ্ক তাহার সমস্ত চিন্তা অবশ করিয়া দিল। সে সবেগে আপনাকে ঠেলিয়া লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সেখানে এমি পিয়ানোর সহিত সলাজ কণ্ঠে গান গাহিতেছে!

কিছুক্ষণ অশ্রু-বর্ষণে হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া আসিলে নলিনী চোখ মুছিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং যেন কি একটা কার্য্য উপলক্ষ্যে ভিন্ন দ্বার দিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে—এই ভাণ করিয়া দ্বারের নিকট আসিয়াই, অন্ধকার পথে সর্প দেখিলে লোক যেমন প্রাণপণে গতি অবরুদ্ধ করে সেইরূপ থমকিয়া দাঁড়াইল। তরঙ্গিনী "ঐ মিসেস দাস" এই কয়টা কথা উত্তপ্ত তৈলের মত তাহার কর্ণ-কুহরে ঢালিয়া দিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া গেলেন এবং সে সম্মুখে দেখিল তাহার স্বামীর সহিত এক সুন্দরী নারী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পরিচ্ছদে—অলঙ্কারে—বসনে ভঙ্গিমায়, বিলাস যেন ফেনিল উচ্ছাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। যেমনই নিখুঁত চেহারা, তেমনই প্রসাধনের ক্ষমতা। নিতান্ত লক্ষ্য করিয়াও বোধ করি তাহার অঙ্গ বা বেশ-ভূষায় কেহ কোনও দোষ ধরিতে পারিত না। কৃষ্ণকেশদাম সযত্ন-রক্ষিত—পরণে একখানি শাড়ী—সাদা সিল্কের উপর ঘোর লাল সিল্কের পাড়—ব্রাহ্ম ধরণে ঘুরাইয়া পরা—পায়ে জুতা মোজা। বেশে যে খুব বেশী আড়ম্বর ছিল তাহা নহে—কিন্তু এমনই কৃতিত্ব ও দক্ষতার সহিত সে নিজেকে সাজাইয়াছিল—যে তাহার আগমনে ও অঙ্গনিঃসৃত বিলাতী উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্যের সুবাসে সেই সুসজ্জিত গৃহে যেন একটা রূপের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। সুবেশিনী সত্যেন্দ্রের সহিত পাশাপাশি

আসিতেছিল—নলিনীকে দেখাইয়া সত্যেন্দ্র কি একটা বলিল তাহা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না—সে আবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্রের কথা শেষ হইবামাত্র সরোজিনী সুমিষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—ইনিই আপনার স্ত্রী? বাঃ কি সুন্দর চেহারা—ছবি। মিঃ সেন, আপনি ভাগ্যবান।

এই বলিয়া হাসিয়া নলিনীর শীতল হস্তখানা নিজের কোমল মুষ্টিতে আবদ্ধ করিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড়ই সুখী হলুম—মিসেস্ সেন!

পরিষ্কার বাংলা—কিন্তু এতগুলা কথার একটাও বোধ করি নলিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে না পারিল উত্তর দিতে—না পারিল অন্ততঃ মুখে একটু হাসি আনিয়া ভদ্রতা বজায় রাখিতে।

কিন্তু তাহাকে বাঁচাইয়া দিল অনিল। সে সহসা উভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া—লেমনেডের আলমারীর চাবিটা খুলে দিয়ে যানতো মিসেস্ সেন—বাবুলাল বলছে চাবিটা আপনার কাছে আছে—এই কথা বলিয়া ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল। নলিনী—স্বামী বা সরোজিনী—কাহারও পানে না চাহিয়া, উভয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া—মাপ কর্বেন—আমি আসছি। এই বলিয়া কোনও মতে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিল। এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া সত্যেন্দ্রও যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

কিন্তু নলিনী যাইবামাত্র তাহার মুখ কঠিন ভাব ধারণ করিল। সে সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, আপনি আজ আমার ওপর যে রকম অত্যাচার করেছেন এ রকম আর কখনও হয় নি।

সরোজিনীর মুখে একটা কুটিল হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি সত্যেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, এইটেই আমার সব চেয়ে বড় চাল হয়েছে। কিন্তু আজ আপনাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে—যাতে লোকে বোঝে, যে মিসেস্ দাস কল্‌কাতার একজন respectabic Lady Doctor. সে আপনাদের সমাজের অযোগ্য নয়। পরে পুনরায় বলিল, পুরুষদের জন্যে আমি ভাবি না—আমি ভয় করি এই সব মিসেসের দলকে। আপনার help ছাড়া আমি এদের win কর্ত্তে পার্ব্ব না।

সত্যেন্দ্র বিরক্ত ভাবে কিছুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অদূরে সুশীল যেখানে বেহালা বাজাইতেছিল, সেইখানে যাইয়া বেহালা শুনিবার ভাণ করিয়া মিসেস্ দাসের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র যাইবামাত্র যতীন চৌধুরী কোথা হইতে আসিয়া সগর্ব্বে মিসেস্ দাসের পার্শ্বদেশ অধিকার করিলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগত মহিলাগণের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলেন।

অনিল নলিনীকে লইয়া আবার সেই বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও সেখানে কেহ ছিল না। নলিনী আসিয়া তাহার

দিকে একবার বিষন্ন চক্ষুদুটি স্থাপন করিয়া পুনরায় উহা আনত করিয়া কহিল, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি! আপনি আজ সকালে বন্ধুত্বের কথা বলছিলেন না? যথার্থই আমি আজ বন্ধুর অভাব বোধ কচ্ছি—আজই আমার সেই রকম একজন বন্ধুর প্রয়োজন হয়েছে! এত শীঘ্র যে দরকার হবে—এই কয় ঘণ্টা আগে আমি তা ভাবিনি!

আবার সেই ইঙ্গিত! আত্মসম্বরণ করা বুঝি আর যায় না! অনিল বহুকষ্টে হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া কহিল, মিসেস্ সেন, আমি জানতুম—একদিন আপনার প্রয়োজন হবেই! কিন্তু আজই?

নলিনী স্থির স্বরে বলিল, হাঁ আজই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অনিল কহিল, মিসেস্ সেন, আমি স্বীকার কচ্ছি—মিসেস্ দাসকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে এনে সত্যেন নৃশংসতার কাজ করেছে—

কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া নলিনী কহিল, ডাঃ চ্যাটার্জী, আজ সকালে আপনি যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তার মর্ম্ম আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি। তারপর কণ্ঠে মৃদু অনুযোগ মাখাইয়া মিষ্টতম কণ্ঠে আদরের সুরে বলিল, আপনি তখনই আমায় সব খুলে বল্লেন না কেন? আপনার উচিত ছিল বলা।

একটা তড়িৎ প্রবাহ অনিলের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া বহিয়া গেল।

সে আবেগের সহিত বলিল, আমি পারিনি। পুরুষ হয়ে আর একজন পুরুষের সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা উচ্চারণ কর্ত্তে আমার বেধে ছিল।

সম্পূর্ণ সত্য। এই দীর্ঘ আলাপের মধ্যে—কি পুরুষ কি নারী—ব্যক্তিগত ভাবে তাহাকে কাহারও নিন্দা করিতে নলিনী শুনে নাই। এত দুঃখেও ডাক্তারের প্রতি একটা শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস নলিনীর অন্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল।

অনিল পুনরায় কহিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি তখন জানতুম না—যে আজ তাকে নিয়ে সত্যেন এই কীর্ত্তি কর্ব্বে। বোধ হয় তাহলে আমি আপনাকে সব কথা বলতুম। অন্ততঃ এই প্রকাশ্য অপমান থেকে আপনাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ত্তুম।

নলিনী কহিল, শুধু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে? আমার অনুরোধ—মিনতি—সমস্ত উপেক্ষা করে—এই বাড়ীখানা কলঙ্কিত করেছে। ডাঃ চ্যাটার্জী, সবাই সকৌতুকে আমার পানে চাইছে—আমার স্বামীর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে। আমি কি করেছি যে এই রকম করে আমাকে—নলিনী আর বলিতে পারিল না।

এতক্ষণে অনিলের অন্তরে পূর্ণমাত্রায় শয়তানের ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। উচিতানুচিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা লুপ্তপ্রায়। সে

কহিল মিসেস্ সেন, যদি আমি আপনাকে ঠিক বুঝে থাকি—তবে আমার বিশ্বাস যে, যে আপনার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে—তার সঙ্গে আপনি থাকতে পার্ব্বেন না। আপনার প্রকৃতি সেরূপ নয়। যে স্বামী প্রতি মূহুর্ত্তে আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কচ্ছে বলে মনে হবে—যার দৃষ্টি—কণ্ঠ—স্পর্শ—অনুরাগ, সবের মধ্যে আপনি ছলনা প্রবঞ্চনা দেখবেন—কোন প্রাণে, কিসের আকর্ষণে—তার সঙ্গে এক গৃহে আপনি বাস কর্ব্বেন? যখন বাহিরে আর ভাল লাগবে না—তখন মুখ বদলাবার জন্যে সে আপনার কাছে আসবে—আপনাকে তার চিত্তবিনোদন কর্ত্তে হবে। তার মনোহরণ কর্ত্তে হবে। অন্যে আসক্তি নিয়ে সে আপনাকে স্পর্শ কর্ব্বে। আপনি হবেন তার ছদ্মবেশ।

আবার সেই রোদনের উচ্ছ্বাস! অনিলকে বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। দুইহস্তে মুখ ঢাকিয়া কিয়ৎকাল অশ্রুবর্ষণ করিবার পর কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া নলিনী কহিল, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী, আপনিই বলুন, আমি এখন কি কর্ব্ব! আপনি বলেছিলেন আমার বন্ধু হবেন—বন্ধুর কাজ করুন—বলুন আমি এখন কি কর্ব্ব?

আর বাধা কি? আর দূরত্বের আবরণের প্রয়োজন কি? অনিল পরিষ্কার স্বরে কহিল—তবে শুনুন—স্ত্রী পুরুষের আবার বন্ধুত্ব কি? তাদের মধ্যে শত্রুতা থাকতে পারে, শ্রদ্ধা থাকতে পারে—

ভালবাসা থাকতে পারে—কিন্তু বন্ধুত্বের স্থান কোথায়? আমি তো বিশ্বাস করিনা। মিসেস্ সেন, আমি—আমি—আপনাকে ভালবাসি।

বিভীষিকা দর্শনে আতঙ্কিত ব্যক্তির ন্যায় সভয়ে দুই পা পিছাইয়া আসিয়া নলিনী কহিল, না—না—

একাদশ পরিচ্ছেদ

কয়েক হস্ত দূরে বারাণ্ডায় এই যে জীবন মরণের সমস্যার মীমাংসা হইতেছিল—গৃহ মধ্যে কাহারও সেদিকে লক্ষ্য ছিলনা। এমির পিয়ানো ও সুশীলের বেহালার মিষ্ট আওয়াজে তখন ঘর পরিপূর্ণ। অতিথিবর্গের কাহারও সংবাদ লইবার অবসর ছিলনা।

উন্মত্তের ন্যায় অনিল বলিতে লাগিল হাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার চেয়ে প্রিয়—সংসারে আমার আর কিছু নেই! তোমার স্বামী তোমায় কি দিয়েছে? তার যা কিছু সে ঐ চরিত্রহীনাকে অর্পণ করেছে। তোমাকে উপহাস কর্ত্তে, তোমারই গৃহে তাকে এনেছে। কিন্তু আমি? আমি তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দিচ্ছি।

দ্বিধাপূর্ণ কণ্ঠে নলিনী কহিল, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী।

অনিল উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিল, যেদিন আপনাকে আমি এলাহাবাদে প্রথম দেখেছি—সেই দিনই আমার বুকের ভেতরটা ওলট-পালট হয়ে গেছে! তারপর এই দীর্ঘ আলাপে—তোমার অতুলনীয় স্বভাবের পরিচয় পেয়ে, তিল তিল করে আমি তোমায় ভালবেসেছি। এ উপন্যাসের প্রথম দর্শনের মোহ নয়—যথার্থ প্রেম। দিনে দিনে, একটু করে বর্দ্ধিত

হয়েছে। অজ্ঞাতে আমার সমস্ত হৃদয়টা অধিকার করে বসেছে। নীরস বট যেমন নিজের নিহিত সঞ্জীবনী শক্তিতে শাখা প্রশাখায় মুঞ্জরিত হয়—এও তেমনি নিজের শক্তিতে তিলতিল করে বেড়েছে। আকাঙ্খিকে পাওয়ার আশা দূরে থাক্—তার কাছে কখনও একটা সমবেদনার ভাষাও আশা করে নি—কিন্তু তথাপি মরেনি। কখনও তোমার মুখে সহানুভূতির একটা অক্ষরও আমি শুনিনি—কিন্তু বুঝি সেইজন্যই আমার ভালবাসা আরও বর্দ্ধিত হয়েছে! এখন আমার সমস্ত অন্তরটা তোমার প্রতি ভালবাসায় ভরে গেছে। নলিনী, এই অবিশ্বাসী স্বামীর সঙ্গ তুমি ত্যাগ কর। স্বীকার করি—তাতে নানান্ কথা উঠবে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? যারা তোমার দুঃখকে তৃণখণ্ডের ন্যায় অগ্রাহ্য করে, সেই সব নিন্দুকের ভয়ে তুমি তোমার এই, নবীনজীবন ব্যর্থ কর্ব্বে?

প্রেম কি সমস্ত বিবেক অপহরণ করিয়া মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয়?

নলিনী বেতসলতার ন্যায় কাঁপিতে ছিল—সে বদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমার সাহস হয় না।

অনিল বলিতে লাগিল, সাহস আস্তে হবে। নলিনী, আমি তোমার শিরে কলঙ্কের পশরা তুলে দেব না। আমি তোমায় বিবাহ কর্ব্ব। সবাই জানবে, কেন তুমি গৃহত্যাগ করেছ! কোনও হৃদয়বান ব্যক্তি তোমায় দূষবে না। পাপ? পাপ

কাকে বলে? পুরুষ যখন নির্লজ্জা চরিত্রহীনার জন্য তার সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করে -তখন পাপ হয় না? আমি বলছি যে, যে স্বামী স্ত্রীকে অপমান করে তার সঙ্গে বাস করা পাপ। তুমি বলেছিলে ভালমন্দর মধ্যে মিটমাট করে চলা তোমার স্বভাব নয়—এখনও তা কোরো না।

কম্পমানা দেহখানার ভার একটা রেলিংয়ের উপর রাখিয়া, নলিনী অস্ফুটস্বরে বলিল—কিন্তু যদি আমার স্বামী আবার আমার কাছে ফিরে আসে?

তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বরে অনিল কহিল, এলেই তুমি তাকে আবার গ্রহণ কর্ব্বে? তোমাকে আমি যা ভাবতুম—দেখছি তুমি তা' নও। ঐ ঘরের মধ্যে যে সব অপদার্থ নারীর দল বিচরণ কর্চ্চে—তুমিও তাদেরই দলে!

নলিনী কাতর কণ্ঠে কহিল, আমি ভেবে দেখি!

অনিল অধীর স্বরে কহিল, কিন্তু সময় কোথা?

নলিনী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বুকের মধ্যে সহসা কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—ডাঃ চাটার্জ্জী, তা হবে না।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় অনিলের সমস্ত উত্তেজনা একমুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। সে শুধু বলিল—মিসেস্ সেন, আপনি আমার বুক ভেঙে দিচ্ছেন।

নলিনী কাতর কণ্ঠে বলিল—কিন্তু আমার বুক যে ভেঙে গেছে!

অনিল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—মিসেস্ সেন, কালই আমি চিরদিনের জন্য কলকাতা ত্যাগ কর্ব। আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আজ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র আমাদের মিলন হয়েছিল—কিন্তু আর নয়—আর কখনও তা হবে না। আমরা পরস্পরের সংস্পর্শে আর কখনও আসব না! আমি চল্লুম—আপনি সুখী হোন।

এই বলিয়া বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া, সেস্থানে ত্যাগ করিয়া সে একেবারে নীচে নামিয়া গেল। নলিনী স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গেল ! এই বিপদের ঘোর দুর্দ্দিনে- যখন সংসার বিশাল মুখব্যাদান করিয়া এই ক্ষুদ্রা নারীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে —তখন তাহার একমাত্র বন্ধু—হাঁ, বন্ধুই বটে—তাহাকে চির দিনের মত পরিত্যাগ করিয়া গেল !! হাঁ—সত্যই সে গিয়াছে। সে মিথ্যা বলে না—আজ সে যে কথা বলিয়া গেল—তাহা অসার ভয় দেখানো কথা নহে—দুর্ব্বলচেতার দ্বিধাময় সংকল্প নহে—স্থির সত্য। সে গিয়াছে- আর আসিবে না। কোন অজ্ঞাত দেশে আত্মগোপন করিয়া, আত্মীয় অনাত্মীয়—সকলের বন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া—তাহারই ধ্যানে সে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিবে—কখনও তাহার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে না ! আর সে ? এই কলঙ্কিত গৃহে—সকলের উপহাসের পাত্রী হইয়া—এই মর্ম্মদাহী লাঞ্ছনা বুকে করিয়া তাহাকে দিনপাত করিতে হইবে। স্বামী বিলাসের সঙ্গিনী হইয়া—হীন বারনারীর মত- অবসরে তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করিতে হইবে। যে তাহাকে যথার্থ ভালবাসে— তাহার সুখ দুঃখ যে নিজের বলিয়া বরণ করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব তাহার পদতলে লুটাইয়া দিতে আসিয়াছিল—সে তাহার নিষ্ঠুর

উপেক্ষায় হৃদি-ভঙ্গ হইয়া—তাহার সুস্থ সবল গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ-খানি লইয়া চিরদিনের মত গৃহ ত্যাগ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিল। তাহারই জন্য! নির্ব্বোধ সে! তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার শেষ আশ্রয় স্থলকে স্বেচ্ছায় শিথিল মুষ্টির বন্ধন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। কিন্তু—উপায় তো রহিয়াছে! কাল প্রভাত—এখনও অনেক বিলম্ব। এখনও সে তাহাকে ধরিতে পারে—তাহার সরল চিত্তে ঈপ্সিত স্থানটুকু অধিকার করিয়া, যে তাহাকে যথার্থ ভাল বাসে—তাহাকে আশ্রয় করিয়া আবার সংসার-সমুদ্রে তরণী ভাসাইতে পারে। এখনও সময় আছে। কিন্তু কাল—আর কোনও উপায় থাকিবে না। আজ যদি এ সুযোগ সে পরিত্যাগ করে—তবে কাল হইতে এই দীর্ঘ জীবন ভার তাহাকে টানিয়া বেড়াইতেই হইবে। না-না—তা সে পারিবে না। উপেক্ষার তীব্র বিষে জর্জ্জরিত হইয়া—তিল তিল করিয়া সারাজীবন ধরিয়া দগ্ধ হওয়া—বুঝি তার ক্ষুদ্র শক্তির বাহিরে! না—তাহা অসম্ভব! সে তাহার সহিত ভাসিবে—আর দ্বিধা নাই! যদি দুঃখ পাইতে হয়, তবে যে তাহাকে যথার্থ ভালবাসে—সে তাহার পার্শ্বে থাকিয়া সমবেদনায়, স্নেহে, তাহার দুঃখভার লাঘব করিবে।

কিন্তু—না। আর ভাবিবার সময় নাই। বিলম্বে আজীবন আক্ষেপমাত্র সার হইবে—কোনও প্রতীকার থাকিবে না। আর সময় নাই!

*　　*　　*　　*

শ্রান্ত চরণ দুখানাকে কোনও মতে টানিয়া লইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল অতিথিরা ভোজন টেবিলে বসিয়া গিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হাস্যরোলে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আর তাহার স্বামী—সেই রমণীর পার্শ্বে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছে।

নলিনীর পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া, কাঁটা চামচখানা টেবিলের উপর রাখিয়া সুশীল বলিয়া উঠিল, By jove—Mrs. Sen, আপনার কি অসুখ করেছে?

হাঁ, বড্ড মাথাটা ধরেছে—বলিয়া বহুকষ্টে স্বামীর দিকে একবার চোখ তুলিয়াই নলিনী কহিল, তেমন কিছু নয়—সেই মাথার যন্ত্রণা। একটু rest নিলেই—আজ রাত্রে আর—তারপর অতিথিবর্গের দিকে ফিরিয়া—যদি মাপ করেন—বলিতেই সুশীল বলিয়া উঠিল, মাপ? আপনি এখনই এস্থান ত্যাগ না কল্লে আমরা বিশেষ দুঃখিত হব—just retire please

সুশীলের কথা শেষ হইবামাত্র সে টলিতে টলিতে একেবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। তারপর একখানা কাগজে কোনও মতে দু'ছত্র লিখিয়া, খামে ভরিয়া, স্বামীর শিরোনামা লিখিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া, খিড়কীদ্বার দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

* * * *

সেদিন রাত্রে ভোজন টেবিলে আর তেমন জমিল না। অতিথিবর্গ একে একে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

নলিনী যাইবামাত্র সরোজিনীর মুখে কে যেন একটা কালীর ছোপ মাখাইয়া দিল। অভ্যাগতদিগকে কাটাইয়া সকলের অলক্ষ্যে তিনি ধীরে ধীরে নলিনীর গৃহাভিমুখে চলিলেন। দ্বার রুদ্ধ। পার্শ্বের গৃহদ্বার মুক্ত। তিনি সেই দ্বারপথে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেই ঘর হইতে নলিনীর ঘরে যাইবার একটি পথ রহিয়াছে। সেই দ্বার দিয়া তিনি নলিনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মূল্যবান পালঙ্কের ওপর দুগ্ধফেণনিভ শয্যা কিন্তু শূন্য। এইমাত্র যে কেহ তথায় শয়ন করিয়াছিল তাহাও বোধ হয় না। তবে? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন একখানা টিপয়ের উপর একখানা পত্র। দ্রুতপদে সেই টিপয়ের নিকট যাইয়া পত্রখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন— শিরোনামায় সত্যেন্দ্রের নাম। নারীর কৌতুহল! একবার চারিদিকে চাহিয়াই ক্ষিপ্র হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র পত্র। কোনও পাঠ নাই। তাড়াতাড়ি এই কয়টা কথা লিখিত হইয়াছে:—

"আজ এই ঘটনার পর আমাদের একত্রে বাস অসম্ভব। 'ডাক্তার চ্যাটার্জী আমায় যথার্থ ভালবাসেন—আমি তাঁহার আশ্রয়ে

যাইতেছি। অতঃপর তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। আমি চলিলাম—আর কখনও তোমার পথে আসিব না।"

কক্ষের উজ্জ্বল দীপালোক সরোজিনীর চক্ষে ম্লান হইয়া গেল! কি ভয়ানক! তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। এমনই একখানা পত্র একদিন তাঁহারই হস্ত হইতে বাহির হইয়াছিল। তারপর—সেই অবিমৃষ্যকারিতার শাস্তি—এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তিল তিল করিয়া তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে! শাস্তি? না। সে শাস্তি বুঝি আজ আরম্ভ হইল। কিন্তু এখন উপায়? তিনি কোথায়? নলিনীর শয়নগৃহে—গৃহস্বামীর পত্র হস্তে। যদি এ অবস্থায় কেহ তাঁহাকে দেখে?

তিনি দ্রুতপদে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সত্যেন্দ্র নলিনীর গৃহের দিকে যাইতেছিল। সরোজিনীক দেখিয়াই কহিল, আপনি মিসেস্ সেনের কাছে বিদায় নিয়ে এলেন?

হাঁ—বলিয়া সরোজিনী বজ্রমুষ্টিতে পত্রখানা চাপিয়া ধরিলেন।

—সে কেমন আছে?

—এমন বিশেষ কিছু নয়—তবে বড় ক্লান্ত। শুয়ে আছে। মাথাটা বড্ড ধরেছে বলছিল।

আমি দেখে আসি—বলিয়া সত্যেন্দ্র অগ্রসর হইল।

তাহার পথ রোধ করিয়া সরোজিনী কহিলেন, না—না, এমন

কিছু নয়। ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই। বরং সে বলছিল যাঁরা এসেছেন তার হয়ে আপনাকে তাঁদের কাছে মাপ চাইবার জন্যে। তাকে আর এখন বিরক্ত করবার দরকার নেই। একথা সেই আমায় আপনাকে বলতে বল্লে। এতক্ষণ বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার গাড়ীটা এল কিনা একবার দেখবেন?

দেখছি—এই বাবুলাল—বলিয়া সে ফিরিল।

এখন কর্ত্তব্য কি? মুহূর্ত্তের ভুলে একটি জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে! না তাহা হইতে দেওয়া হইবে না। এ যে কি জ্বালা—সেকথা তাঁহার অপেক্ষা আর কে জানে? না—না—তা হইতে দেওয়া হইবে না।

ঠিক এই সময়ে তাঁহার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিয়া চৌধুরী হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কহিলেন আমাকে আর কতদিন এমন Suspense এ রাখবেন।

সহসা যেন কি আশা পাইয়া সরোজিনী চৌধুরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, মিঃ চৌধুরী, যেমন করে হোক—আজ রাত্রের মত সত্যেনকে নিয়ে আপনাকে এ বাড়ী থেকে অন্যত্র থাকতে হবে।

চৌধুরী—সে কি? এই বলিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী অধীরস্বরে কহিলেন, প্রশ্ন কর্বেন না। যা বলছি তাই করুন।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া চৌধুরী প্রফুল্লমুখে কহিল, কিন্তু আমার বখশিশ ?

সরোজিনী কহিলেন—সে কথা পরে হবে। কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যে সত্যেন যদি বাড়ী আসে—তবে আপনার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক থাকবে না। মনে থাকে যেন—এই বলিয়া তিনি দ্রুতপথে প্রস্থান করিলেন।

চৌধুরী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, একটা উইলের ব্যাপারের অছিলায়, সত্যেন্দ্রকে লইয়া নিজের মোটর গাড়ীতে চড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি দ্বিপ্রহর। অনিলের ড্রয়িংরুমের একখানা সোফায় বসিয়া নলিনী অধীর আগ্রহে সময় গণণা করিতেছিল। তখনও অনিল গৃহে আসে নাই। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে যে, কল্য প্রত্যুষে হঠাৎ কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সে টালায় কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য সকৃতজ্ঞ ভাবে বলিয়াছিল, তাহার সদাশয় প্রভু তাহাকে রাত্রে দুইখানা নোট দিয়া একটা চাকরী দেখিয়া লইতে বলিয়াছেন। যেহেতু দেশে ফিরিবার আর তাঁহার সম্ভাবনা নাই। বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ময়লা চাদরের প্রান্তে তাহার চোখ দুইটা মুছিয়াছিল।

কিন্তু আরতো বসিয়া থাকা যায় না। এতক্ষণে নিশ্চয় সত্যেন্দ্র তাহার পত্র পাইয়াছে! যদি স্বামীর হৃদয়ে তাহার এতটুকুও স্থান থাকিত, তবে সে নিশ্চয় এতক্ষণে তাহাকে জোর করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইত। কিন্তু সে সব দিন ফুরাইয়াছে। সেই সুবেশা সুন্দরী এখন তাহার স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। সে তাহার পিসীমার কাছে শুনিয়াছিল, সেকালে নাকি নানা

প্রকার তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে মানুষ মানুষকে বশীভূত করিতে পারিত। সেই রমণী কি সেই মন্ত্র জানে? নহিলে তাহার অমন স্বামী—

কিন্তু এইভাবে গৃহত্যাগ করাই কি তাহার উচিত হইয়াছে? তাহার নিজের গৃহে—এই নীচ, ব্যভিচারের অভিনয় দ্বারা—যে তাহাকে ও তাহার গৃহকে যুগপৎ কলঙ্কিত করিয়াছে—তাহার গৃহে তাহার অনুকম্পা ও দয়ার পাত্রী হইয়া আজীবন বাস করা—না। সে ঠিকই করিয়াছে। যে তাহাকে যথার্থ ভালবাসে তাহাকে অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু—এই ভালবাসা কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে? সেও তো পুরুষ! বিশেষ তাহার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে সে তাহাকে কি দিতে পারিবে? তাহার সদানন্দ চিত্তের বিনিময়ে সে তাহাকে দিবে বর্ষণান্ধ চক্ষু—হিম-শীতল প্রাণ। সেখানে আনন্দের আলোক স্তিমিত হইয়াছে। সে ওষ্ঠে সরল হাসি ফুটিবার আর সম্ভাবনা নাই। যদি প্রণয়ের প্রথম মোহের অবসানে সে তাহাকে ত্যাগ করে? না। মুহূর্ত্তের অবিমৃষ্যকারিতায় সহসা একটা কিছু করা অপেক্ষা ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া হইবে? এতক্ষণ সত্যেন্দ্রের হাতে সে চিঠি পড়িয়াছে। সে এতক্ষণ তাহাকে কি ভাবিতেছে—কে জানে? যাক্! যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন আর উপায় নাই। কল্য প্রত্যুষে অনিলের সহিত কলিকাতা ত্যাগ করাই স্থির।

কিন্তু এমন হইতেছে কেন? সর্ব্বাঙ্গে কিসের দংশনের জ্বালা—সে জ্বালাতো শুধু বাহিরে নয়! বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কাল প্রত্যুষে সবাই জানিবে! সহরময় তাহার নামে যে কুৎসা উঠিবে তাহা ভাবিতেও তাহার হৃৎকম্প হইল! একি প্রতিশোধ? সরোজিনীর সহিত কাল আর তাহার কোনও পার্থক্য থাকিবেনা। কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সকলে জানিবে—নলিনী অসতী।

ছি! ছি! আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব নয়! সত্যেন্দ্র যাহাই ভাবুক, সে এখনই ফিরিয়া যাইবে। স্বামার পদতলে পড়িয়া মার্জ্জনা চাহিবে। বলিবে ওগো—তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করিও। আমাকে শুধু তোমার গৃহের এক প্রান্তে একটু স্থান দিও। আমি আর কিছু চাহি না। আকস্মিক উত্তেজনায় পিসীমার সমস্ত সুশিক্ষা সে কি করিয়া ভুলিয়াছিল?

এই ভাবিতে ভাবিতে সে উঠিয়া পড়িল। একপদ অগ্রসর হইল। কিন্তু ওকি? কাহার পদশব্দ! নিশ্চয় অনিল ফিরিল! ছিঃ ছিঃ, সে তাহাকে কি বলিবে? এই গভীর রজনীতে—তাহার এই আকস্মিক আগমনের কি কৈফিয়ৎ দিবে? বিশেষ সেই সব কথার পর? তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে পিছাইয়া আসিয়া সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

জুতার শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং সেই শব্দ

যখন দ্বারপ্রান্তে আসিল—তখন নলিনী সবিস্ময়ে দেখিল—সে অনিল নহে—সরোজিনী !!

সরোজিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নলিনীকে দেখিয়াই কহিলেন—আঃ, বাঁচলুম ! নলিনী, তোমাকে এখনই বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

একি সম্বোধন ? 'মিসেস্ সেন' বলিয়া সম্বোধিত হইবার গৌরব হইতে সেকি ইহারই মধ্যে বঞ্চিত হইয়াছে ? সে স্তম্ভিতের ন্যায় কহিল—বাড়ী ?

সরোজিনী আদেশের ন্যায় কহিলেন, হাঁ—এখনই। এক সেকেণ্ড ও নষ্ট কর্লে চল্‌বে না—ডাক্তার চ্যাটার্জি এখনই আসবেন—চল।

এই বলিয়া তিনি নলিনীর হাত ধরিতে অগ্রসর হইলেন। নলিনী সভয়ে সোফাখানার কোনে সরিয়া গেল। সরোজিনী থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। পরে যে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন সেইস্থান হইতেই কহিলেন, থাক্—যদি আপত্তি থাকে—আমি তোমায় ছুঁতে চাই না। কিন্তু ফিরে তোমাকে যেতেই হবে। আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—তুমি সেই গাড়ীতে বাড়ী যাও।

নলিনী সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, মিসেস্ দাস, আপনি যদি এখানে না আসতেন—তবে আমি নিশ্চয়ই ফিরে যেতুম। কিন্তু এখন আর কিছুতেই যাবনা। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—যে আমার স্বামীই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমাকে সাক্ষীগোপাল করে নিশ্চিন্তে ব্যভিচার চালাবার জন্য আমাকে নিতে পাঠিয়েছেন।

মিসেস দাস অস্ফুট কণ্ঠে বলিবার চেষ্টা করিলেন—না নলিনী—

কিন্তু নলিনী পুনরায় বলিতে লাগিল, আপনি ফিরে যান। আমার গৃহেই ফিরে যান। আমার স্বামী আজ আর আমার নন। তিনি আপনার—সম্পূর্ণরূপে আপনারই। বোধ হয় তিনি একটা কেলেঙ্কারীর ভয় কচ্ছেন। পুরুষ এমনই কাপুরুষ! সংসারের কোনও নিয়ম লঙ্ঘন কর্ত্তে তারা ভয় পায় না—ভয় পায় শুধু তার রসনাকে। কিন্তু তা হবে না। এ কেলেঙ্কারী তাঁকে সইতেই হবে।

তারপর সে পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া কহিল, এত বড় কেলেঙ্কারী কল্‌কাতা সহরে অনেক দিন হয় নি! কাল প্রত্যেক সংবাদ পত্রে—প্রত্যেক লোকের মুখে—তাঁর নামের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারিত হবে!

এই বলিয়া সে হাত হইতে স্বামীদত্ত বালাজোড়া খুলিয়া, সোফার উপর নিক্ষেপ করিয়া কহিল, এই নাও। আমার প্রতি প্রেমের অভাব আমার স্বামী এই বালাজোড়া দিয়ে ঢাক্‌বার চেষ্টা করেছিলেন—যাও—নিয়ে যাও—তাঁকে ফেরৎ দিও।

সরোজিনী সশঙ্কিত ভাবে কহিলেন, না—না—

নলিনী কহিল, যদি সে নিজে আস্‌তো, তবে আমি নিশ্চিত ফিরে যেতুম—আমায় যে অবস্থায় রাখ্‌তো সেই অবস্থায়ই থাকতুম।

কিন্তু নিজে ঘরের কোণে আত্ম-গোপন করে তোমাকে দূতীস্বরূপ পাঠিয়েছে! আমি কিছুতেই যাব না। তাহার কণ্ঠ স্থির।

সরোজিনী কাতরকণ্ঠে কহিলেন, নলিনী, তুমি তোমার স্বামীর ওপর অবিচার কর্চ্ছ! তুমি যে এখানে আছ—এও সে জানে না। সে জানে তুমি তোমার ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছ। তোমার চিঠি সে পায় নি!

নলিনী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, তুমি আমায় এতই নির্ব্বোধ মনে কর—যে এই নির্লজ্জ মিথ্যা কথা কয়ে তুমি আমায় ভোলাবে?

সরোজিনী সংযত স্বরে কহিলেন, আমি সত্য কথাই বলেছি!

কণ্ঠস্বরে সংশয় মাখাইয়া নলিনী কহিল,—যদি স্বামী আমার চিঠি না পড়ে থাকে, তবে তুমি এখানে কি করে এলে? নিতান্ত নির্লজ্জার মত যে গৃহ তুমি এতক্ষণ কলুষিত করেছিলে—সেই কলঙ্কিত গৃহ যে আমি ত্যাগ করেছি—একথা তোমাকে কে বল্লে? আমি যে এখানে এসেছি—তাই বা তুমি কেমন করে জান্‌লে? আমি সব বুঝতে পেরেছি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমার স্বামী তোমায় পাঠিয়েছে।

সরোজিনী কহিলেন,—আমায় বিশ্বাস কর নলিনী, সে চিঠি তোমার স্বামী দেখেননি। আমিই তা দেখেছি—আমিই সে চিঠি খুলেছি!

জন্ম তিথি

নলিনী কহিল, এই কথা তুমি আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বল? আমি আমার স্বামীকে যে চিঠি লিখেছি, তুমি তা খুলেছ? পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—এতদূর সাহস তোমার হবে না।

সরোজিনী আবেগের সহিত কহিলেন, সাহস? যে গহ্বরে নাম্‌বার জন্যে তুমি পা বাড়িয়েছ—তোমাকে সেখান থেকে তোল্‌বার জন্যে না কর্ত্তে পারি -এমন কাজ সংসারে নেই। বলিতে বলিতে তাঁহার সুন্দর মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—তাঁহার কণ্ঠস্বরের অকৃত্রিমতা ও দৃঢ়তায় নলিনী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল। তিনি হস্তস্থিত ব্যাগ হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া কহিলেন, এই দেখ সেই চিঠি। তোমার স্বামী এ পত্র দেখেন নি—কখনও দেখবেনও না। বলিয়া তিনি পত্রখানা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া বাতায়ন-পথে নীচে ফেলিয়া দিলেন।

নলিনী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, কিন্তু যে কাগজখানা তুমি ছিঁড়ে ফেল্‌লে—ঐখানা যে আমারই চিঠি—তা আমি কি করে জান্‌ব?

সরোজিনী আহতের ন্যায় বলিলেন,—আমার সব কথাই তুমি অবিশ্বাস কর্ব্বে? ভেবে দেখ, তোমাকে এই প্রমাদ থেকে রক্ষা করা ছাড়া আমার আসার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আমি শপথ করে বল্‌ছি -ঐখানাই তোমার চিঠি।

নলিনী সংশয়পূর্ণ স্বরে কহিল, আমাকে না দেখিয়েই তুমি চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেল্‌লে। না—আমার বিশ্বাস হয় না।

পরে নিষ্ঠুর অবজ্ঞাভরে বলিল—যার সমস্ত জীবন একটা মিথ্যার আবরণ মাত্র—তার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

এ আঘাতও সহ্য করিয়া সরোজিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবসান করিয়া কহিলেন—সে যাই হোক্—আমাকে তুমি যা ইচ্ছা তাই ভাব'—আমাকে যা খুসী বলো—কিন্তু ফিরে তোমাকে যেতেই হবে।

নলিনী স্থির স্বরে বলিল, আমি যাব না। কারণ, আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি না।

সরোজিনী কহিলেন, তুমি তাঁকে যথেষ্ট ভালবাস—আর তুমি এও বেশ জান—যে তিনিও তোমায়—শুধু তোমাকেই ভালবাসেন।

নলিনীর সন্দেহের মূল দেশটা কে যেন আর একবার সবেগে নাড়িয়া দিল। কিন্তু তখন সে নাকি নিতান্ত বহির্মুখী—তাই সে পুনরায় কহিল, ভালবাসার মর্ম্ম তুমিও যা বোঝ—তিনিও ততটুকুই বোঝেন। কিন্তু তোমরা কি চাও—আমি তা বুঝেছি। আমাকে মাঝখানে রেখে এই নির্লজ্জ ব্যভিচার তোমরা স্বচ্ছন্দে চালাতে চাও। আমি নৈলে সমাজের চোখে ঠুলি আঁটা হয় না!

দুই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া অধীর স্বরে সরোজিনী কহিলেন,—

ছি ছি নলিনী—এযে একেবারে মিথ্যা। এত বড় মিথ্যা যে আমি কল্পনাও কর্ত্তে পারি না! এরকম করে তোমার স্বামীর প্রতি অবিচার কোরো না। শোন, তোমাকে শুনতেই হবে! তুমি তোমার গৃহে ফিরে যাও। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—শপথ কচ্ছি—তোমাদের পথে আমি আর কখনও আসব না—তোমার স্বামীর ছায়াও স্পর্শ কর্ব্ব না। আমায় বিশ্বাস কর নলিনী, যে অর্থ তোমার স্বামী আমায় দিয়েছেন—তা প্রেমের অবদান নয়—পূজার অর্ঘ্য নয়—তা ঘৃণার দাম। তোমার স্বামীর ওপর আমার যা জোর—

নলিনী কহিল, আমার সম্মুখে আমার স্বামীর ওপর তোমার জোর আছে—একথা স্বীকার কর্ত্তে তোমার বাধ্‌লো না?

সরোজিনী কহিলেন—না। যেহেতু আমার সে জোরের মূলে তোমার স্বামীর অগাধ পত্নী-প্রেম।

নলিনী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, এই কথা তুমি আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বল?

সরোজিনী বলিলেন—হাঁ। তার কারণ, একথা সম্পূর্ণ সত্য! তোমার স্বামী তোমায় নিঃসংশয়ে ভালবাসেন—তাই আমার সহস্র অত্যাচার—সহস্র অন্যায় তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। এই ধৈর্য্যের মূলে তোমার প্রতি তাঁর অন্ধ ভালবাসা—গভীর লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য তাঁর ব্যাকুল প্রয়াস।

নলিনী স্তম্ভিতের ন্যায় বলিল, তুমি কি বলছ ?

সরোজিনী বলিলেন, কিছু নয়। কিন্তু আমি জানি—নিঃসংশয়ে জানি যে, তোমার স্বামী তোমায়—শুধু তোমাকেই ভালবাসেন। আর সে ভালবাসা এত গভীর, যে সারা পৃথিবী খুঁজলেও কোথাও তুমি এমন ভালবাসা পাবে না। আজ মুহূর্ত্তের অবিমৃষ্যতায় তুমি যদি সে ভালবাসার অবমাননা কর—তবে জেন, এমন একদিন আসবে—যে দিন প্রেমের তৃষ্ণায় তোমার কণ্ঠতালু, মেদমজ্জা শুকিয়ে যাবে—কিন্তু সারা বিশ্বে কারও দ্বারে তুমি একবিন্দু ভালবাসাও পাবে না—তোমার স্বামী তোমায় এত ভালবাসেন !

যৌবনের মধ্যপথস্থিতা—আজীবন বিলাসের অঙ্কশায়িতা এই লালসাময়ী নারী, উপরিউক্ত কথা কয়টিতে বুঝি তাহার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা—সমস্ত শিক্ষা নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল। যেহেতু নলিনীর কিয়ৎকালের জন্য বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—সে অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া কহিল—তাহলে আপনি আমায় বোঝাতে চান, যে আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার কোনও দূষ্য সম্পর্ক নেই ?

এই অজ্ঞাতচরিত্রা নারীকে নলিনী আর অসম্মান করিয়া কথা কহিতে পারিল না—বোধ করি তাই সে তুমির স্থলে 'আপনি' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল।

পূর্ব্বের ন্যায় সংশয়হীন কৃত্রিমতা-লেশশূন্য কণ্ঠে তিনি কহিলেন, না—পরমেশ্বরের দিব্য—না। তোমার স্বামী মহেশ্বরের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক—শুভ্রচেতা। আর আমি? তুমি আমায় এই নীচ সন্দেহের চক্ষে দেখ্বে—একথা যদি মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে উদয় হত, তবে আমি মরে গেলেও কখনও তোমাদের জীবনের পথে এসে তোমার চরিত্রবান স্বামীর গতিরোধ কর্ত্তেম না। না—মরে গেলেও না।

নলিনী অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে কহিল, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি হৃদয়হীনা নন। যারা অর্থের জন্য দেহ বিক্রয় করে—প্রেমকে যারা পণ্যদ্রব্যের ন্যায় জ্ঞান করে—তাদের কলঙ্কিত বক্ষের অন্তরালে প্রেমের স্থান কোথা? আমার তো বিশ্বাস হয় না—যে তাদের কঠিন্ অন্তরে কোমল প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আপনাকে আমি অন্যরকম দেখছি।

নলিনী অকপটে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া গেল। বরং তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহার এই উক্তি জল্লাদের নিষ্ঠুর খড়্গের ন্যায় সরোজিনীকে আঘাত করিল; গভীর বেদনায় দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বোধ করি এ প্রহার তিনি সহ্য করিবার চেষ্টা করিলেন। পরে অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় নলিনীকে স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন—কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে তাঁহার সাহস হইল না—তিনি সুগঠন হাতখানি

পিছাইয়া লইয়া কহিলেন, আমি তো বলেছি—আমাকে তুমি যেমন ইচ্ছা ভাব' যা খুসী বল তাতে কিছু যায় আসে না! আমি কারও এক বিন্দু অশ্রুপাতেরও যোগ্য নই। কন্তু মিনতি কচ্ছি—আমার জন্য তোমার অমূল্য জীবন ব্যর্থ করে দিও না! ফিরে যাও। এখনই গৃহে না ফিরে গেলে তোমার অদৃষ্টে যা আছে—তা তোমার কল্পনারও অগম্য। এ খাদে পা দেওয়া যে কি ভয়ানক—তুমি তা জান না। ত্যক্তা, উপেক্ষিতা, সমাজচ্যুতা—সংসারের ঘৃণা, অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকা—ছদ্ম গাম্ভীর্য্যর মুখোস কখন খুলে পড়ে যায়—এই ভয়ে সদাই সশঙ্কিতা—পশ্চাতে সংসারের নিষ্ঠুর হাসি—শোকার্ত্তের অশ্রুর চেয়েও যা করুণ—বিষাদময়—সেই নির্ম্মম হাসির অবিরাম তাড়না—এ যে কি ভয়ানক তুমি তা জানন। লোকে হয়তো জীবনে একবার—একমুহূর্ত্তের জন্য এ পাপের অনুষ্ঠান করে—কিন্তু তারপর সারা জীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করেও ক্রুদ্ধ দেবতার রোষ শান্ত কর্ত্তে পারে না। কিন্তু তোমায় আমি তা জান্তে দেব না। আর আমি? দুঃখভোগে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তবে যতই পাপ করি না কেন—আজ তোমার সম্মুখে যে জ্বালায় আমি জ্বলছি—তাতে আমার সমস্ত পাপ পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। নলিনী, তুমি ঠিকই বলেছ! আমি হৃদয়হীনাই বটে! কিন্তু আজ এই গভীর রাত্রে তুমি আমার শুষ্ক বুকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছ—আবার আজই তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ

করে দিয়েছ। কিন্তু সে কথা যাক্। আমার জীবন আমি ব্যর্থ করেছি। কিন্তু তোমায় আমি রক্ষা কর্ব্ব। তুমি বালিকা—এ কষ্ট তুমি সইতে পার্ব্বে না—সে শিক্ষা তুমি পাওনি। নলিনী, তুমি ফিরে যাও। মনে করে দেখ, তোমার ছেলে আছে। হয়তো সে এতক্ষণ তোমায় খুঁজ্ছে। তার ভবিষ্যতের পানে চাও। যদি তোমার দোষে তার তরুণ জীবন কলঙ্কিত হয়—তুমি ঈশ্বরের কাছে কি বলে জবাব দেবে? যাও। তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন। সে অকৃত্রিম ভালবাসা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে! তাই বা কেন? যদি তোমার স্বামীর সহস্র প্রণয়পাত্রী থাকে, তাহলেও তোমায় ফির্তে হবে। যদি স্বামী তোমার নিষ্ঠুর হন—তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন—তোমায় ত্যাগ করেন—তাহলেও স্বামীর গৃহ ত্যাগ কর্ব্বার তোমার অধিকার নেই। স্বামী যাকে ত্যাগ করেছে—তার ঠাঁই যে তার ছেলের পাশে!

পুত্রের নামোচ্চারণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র সে একান্তে তাঁহাকে নির্ভর করিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কি ভয়ানক! সে কি করিতে বসিয়াছিল। তাহার ছেলে—ওঃ, না জানি সে এখন কি করিতেছে! মুহূর্ত্তের ভ্রমে—অভিমানের বশে সে তাহার শুভ্র ললাটে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতে বসিয়াছিল! আর তিনিই তাহাকে রক্ষা করিলেন—যাঁহাকে সে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম

শত্রুজ্ঞানে পরিহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল! এই গভীর অপমানের হাত হইতে সেই তাহাকে বাঁচাইল। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া তপ্ত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। সরোজিনীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া—কম্পমান দেহভার তাঁহাতে অর্পণ করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল এবং বহুকষ্টে একবার মাত্র অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করিল—আমার বাড়ীতে নিয়ে চলুন!

সরোজিনী হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া অশ্রুরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃথা! দীর্ঘ বিচ্ছেদে, স্নেহ ও ভাবের দৈন্যে অন্তরের যে অশ্রুর উৎস তিনি অনাহারে অনশনে শুষ্ক হইয়া মরিয়াছিল ভাবিয়াছিলেন, কৃত্রিমতার আবরণে ও বিলাসের স্রোতে যাহা লুপ্ত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল—তাঁহাকে আশ্চর্য্য করিয়া দীর্ঘকাল পরে আজ আবার তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সেই নিহিত অশ্রুস্রোত বহিতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠলগ্না নলিনীর কটিদেশ বাম হস্তে জড়াইয়া, দক্ষিণ হস্তে তাঁহার স্কন্ধে রক্ষিত তাহার মস্তকের কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন দ্বারা তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ও কি বলিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডুর অধরে তখন ভাষা ছিল না! তিনি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া নিজের হিম-শীতল বক্ষে তাহার তপ্ত দেহের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলেন এবং

ক্ষণে ক্ষণে রুমালখানা চক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রু শুষিয়া লইতে লাগিলেন।

ঠিক এই এই সময়ে এই নবীনা ও মধ্যযৌবনার অন্তরে—অলক্ষ্যে যে সুপ্ত মাতৃত্বের জাগরণ হইয়াছিল, তাহা উভয়েরই অগোচর ছিল।

বৃক্ষ কি ছায়া অপেক্ষা সুন্দর? যুবতী কি জননী অপেক্ষাও সুন্দরী?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কিছুক্ষণ এই ভাবে অতীত হইবার পর—সমস্ত দুর্ব্বলতাকে সবেগে হৃদয় হইতে ঠেলিয়া দিয়া সরোজিনী কহিলেন, এইবেলা চল, আর দেরী করা চল্‌বে না। বলিয়া হস্তস্থিত রুমালে তাহার সিক্ত আঁখিপল্লব মুছাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই নলিনী বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় সভয়ে তাঁহার হাত ধরিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিল। কহিল, ও কে কথা কইছে?

সরোজিনী কহিলেন, কই, কেউ না ত?

কিন্তু সে স্বর ভুল হইবার নহে। সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল না—না—ঐ যে! আমার স্বামীর গলা! কি ভয়ানক! কি হবে? বলিয়া সে সভয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল।

দূরে সত্যেন্দ্র, চৌধুরী ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের কণ্ঠস্বর ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

সরোজিনী ত্বরিত-চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া, অঙ্গুলী নির্দ্দেশে একটা রুদ্ধদ্বারের সম্মুখলগ্ন পর্দ্দা দেখাইয়া

কহিলেন— ঐ পর্দ্দার আড়ালে যাও। কিন্তু প্রথম সুযোগ প্রাপ্তির সঙ্গে নিঃশব্দে ওখান থেকে স'রে যেতে হবে।

হতভম্ব নলিনী কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই তিনি অধীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন—কথা কইবার সময় নেই—যাও। কিন্তু মনে থাকে যেন, প্রথম সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে হবে—তাছাড়া উপায় নেই। এই বলিয়া তাহাকে প্রায় ঠেলিয়া লইয়া গিয়া, পর্দ্দার অন্তরালে দাঁড় করাইয়া দিয়া, উপস্থিত লজ্জার হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, একটা 'ঘোরান' সিঁড়ি বারান্দা হইতে নীচে বাগানে নামিয়াছে। হায়! যদি নিমেষের আগে এ সংবাদ তাঁহার জানা থাকিত কিন্তু তখন উপায় ছিল না। বন্ধুবর্গের হাস্যমুখরিত স্বর তখন গৃহের দ্বার-প্রান্তে। তিনি ক্ষিপ্রপদে সেই সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিন্তু অনিলের বাটি ত্যাগ না করিয়া, যে দ্বার দিয়া বন্ধুবর্গ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া, রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন গৃহ হাস্যকোলাহলে মুখরিত।

তখন কক্ষমধ্যে সত্যেন্দ্র বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে চৌধুরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, আমাকে এ রকম করে সারারাত আটকে রাখার আপনার উদ্দেশ্য কি?

চৌধুরী নির্লজ্জ হাস্যে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া উত্তর করিল, আহাহা, জলে পড় নিত' হে?

সত্যেন্দ্র কহিল, কিন্তু উইলের কথাটা—

চৌধুরী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিলেন—সেটা একেবারে মিথ্যা কি জান ? কাল ডাক্তার চ্যাটার্জী হঠাৎ কিছুদিনের মতন কল্‌কাতা ছেড়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ঠিক করেছি যে, আজকের রাতটা এইখানেই কাটিয়ে দেব। কি বল ? আইডিয়াটা মন্দ ?

আইডিয়ার ভালমন্দ বিচার অপেক্ষা বাল্যসুহৃদের সম্বন্ধে সত্যেন্দ্র ঘনিষ্ঠতররূপে সংশ্লিষ্ট ছিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, অনিল ? কই সে আমার কিছু বলেনি ত ?

—So you see my boy, আমি না ধরে আনলে অনিলের সঙ্গে তোমার দেখাই হত' না! এই বলিয়া চৌধুরী হাসিতে লাগিলেন। এই সময় সুশীল, চৌধুরীর পানে চাহিয়া কহিল, তারপর চৌধুরী সাহেব, আপনার মিসেস্ দাসের খবর কি বলুন!

কিন্তু সত্যেন্দ্র কিছুমাত্র কৌতুক বোধ না করিয়া ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠেই কহিল, তাঁর খবরে তোমার কাজ কি সুশীল ?

সুশীল সপ্রতিভ ভাবেই বলিল, কিছুমাত্র নয়। তাইতেই তো জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি। নিজের কাজের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে দাদা! বাজে কাজই আমার লাগে ভাল! বলিয়া চৌধুরীর পানে চাহিয়া বলিল, কই, জবাব দিলেন না যে ?

চৌধুরী মরিয়া হইয়া কহিলেন, আমি তাঁকে বিবাহ কর্ব্ব।

সুশীল চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিল তবে যে আপনি বল্লেন—যে আপনি তার নামে কি সব শুনে—

সমস্ত তর্কের অবসান করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে চৌধুরী কহিলেন, "সে সব তিনি আমায় খুলে বলেছেন !

কিন্তু সুশীল ছাড়িল না। মজা দেখিবার জন্য বলিল, আর বিলেত যাওয়াটা—

চৌধুরী অধীরভাবে বলিলেন, তাও।

সুশীল নাছোড়বান্দা। সে পুনরায় কহিল, আর এই সব টাকা কড়ি কোথা থেকে আসে সে বিষয়ে—

সত্যেন্দ্রের মুখ শুষ্ক হইল।

চৌধুরী কহিলেন, সে সব কথা কাল তিনি আমায় বল্‌বেন বলেছেন। তারপর ক্রোধ চাপিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া কহিল, কিন্তু তাঁর চরিত্রে আঘাত কর্ত্তে পার্লে তুমি বড় খুসী হও—না ?

চৌধুরীকে আরও চটাইয়া সুশীল হাসিল। কহিল, মিঃ চৌধুরী, আপনি অনেক টাকা উড়িয়েছেন। চরিত্রও অনেক বার হারিয়েছেন। মোদ্দা temperটা আর lose কর্ব্বেন না। কারণ temper—you have got only one.

চৌধুরী ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন,—দেখ, আমি যদি নেহাৎ ভালমানুষ না হতুম, তাহলে—

সুশীল বাধা দিয়া কহিল, তাহলে আপনার আর একটু খাতির

হত। তারপর হাসিয়া কহিল, আজকালকার ছেলেগুলো কি জ্যাঠা! কলপ দেওয়া চুলেরও খাতির করে চলেনা। কি বলেন চৌধুরী সাহেব?

মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া চৌধুরী বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় অনিলের মোটর গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল এবং অচিরে অনিল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

ব্যাপার কি?—বলিয়া সে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল!

প্রত্যুত্তরে সত্যেন্দ্র তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তোমার ব্যাপার কি বলত? কাল কোথায় চলেছ?

অনিল হাসিয়া বলিল, ও! তাই বুঝি এই farewellএর ব্যবস্থা! একটা ভাল চাকরী খালি আছে Nepal রাজ এষ্টেটে হে। একবার বেয়ে চেয়ে দেখা যাক্!

সত্যেন্দ্র কহিল, কি দুঃখে?

অনিল কহিল, ঠিক দুঃখ না হলেও—সুখের অভাব বটে!

সত্যেন্দ্র ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল, তা আমরা কি খবর পাবার অযোগ্য?

অনিল লজ্জিত হইয়া কি বলিতে চেষ্টা করিয়া সুশীলের কথায় থামিয়া গেল। সে কহিল, upon my word Doctor, you look very romantic to-night, you must be in love. Who is the girl?

কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের ন্যায় থাকিয়া অনিল কহিল, হাঁ। আমি একজনকে ভালবেসেছি। কিন্তু তিনি স্বাধীন নন। পরে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই কহিল, অথবা নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করেন না।

চৌধুরী সকৌতুকে কহিলেন, অর্থাৎ,—তিনি married—বিবাহিতা।

এ বিষয়ে লোকটির অভিজ্ঞতার তারিফ করিতে হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সে কথার উত্তর না দিয়া অনিল কহিল, কিন্তু তিনি আমায় ভালবাসেন না। তিনি যথার্থ সতী। তাঁর মত নারী আমি দেখিনি।

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, দেখান?

অনিল কহিল, না।

সুশীল কহিল—তুমি দুর্ভাগ্য। আমি ঢের দেখেছি! যে স্ত্রী-লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়—আমার তাকেই ভাল লাগে।

অনিল কহিল, তিনি পবিত্রা—নিষ্কলঙ্কা। আমি তাঁর প্রেমের অযোগ্য।

সুশীল কহিল, মোট কথা তিনি তোমায় ভালবাসেন না?

অনিল কহিল, না।

সুশীল কহিল, তুমি ভাগ্যবান। দেখ, লোকে যাকে ভালবাসে, হয় তাকে পায়—নয় পায় না। কিন্তু দুটোই equally tragic. বরং পাওয়াটা বেশী হৃদয়-বিদারক! আচ্ছা চৌধুরী, আপনাকে যে ভাল না বাসে—আপনি কতদিন তাকে ভালবাসতে পারেন?

চৌধুরী প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায়, অভিনয়ের সুরে কহিলেন, —আজীবন।

সুশীল কহিল, আমিও পারি। কিন্তু এ রকম স্ত্রীলোক পাওয়া শক্ত।

সত্যেন্দ্র কৌতুকবোধ করিয়া বলিল, কি রকম ?

সুশীল দুঃখিতভাবে বলিল, আমাকে ভালবাসে না—এরকম রমণীর সঙ্গে আমার আলাপ নেই। ভালবাসা পেয়ে পেয়ে আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু চৌধুরী আমার ঠিক উল্টো। যারা ওঁকে মোটেই ভালবাসে না, তাদেরই উনি বেশী ভালবাসেন। কি বলেন চৌধুরী ?

চৌধুরী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সুশীল অনিলের দিকে ফিরিয়া পুনরায় কহিল, তাহলে এই সতীর বিশ্বাস তুমি কখনও ভঙ্গ কর্বে না ?

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, মানে ?

সুশীল কহিল অর্থাৎ চিরদিন তুমি তারই থাকবে ? তাকেই কেন্দ্র করে জীবন যাপন কর্বে ? বিয়ে কর্বে না ?

অনিল কহিল—দেখ সুশীল, যখন কেউ কাউকে যথার্থ ভালবাসে, তখন অন্য রমণী তার চিন্তারও অতীত থাকে। ভালবাসা মানুষকে এমনই বদ্‌লে দেয়। আমিও বদলিইছি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, প্রেম, ভালবাসা যে কখনও কেতাবের পৃষ্ঠা ছেড়ে

মানুষের বাস্তব জীবনকে অতর্কিতভাবে এসে আক্রমণ ক'রে, জীবনযাত্রার পথে তাদের গতিরোধ করে—এ আমি জানতুম না। কখনও ভাবিওনি। আজ জেনেছি।

সুশীল স্থির স্বরে বলিল, দেখ, ভণ্ডামি আমি কখনও পছন্দ করিনা—তাই চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আমার প্রায়ই ঠোকাঠুকি হয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে কখনও হবে তা আমার জানা ছিল না।

অনিল সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম ?

সুশীল স্থিরস্বরে বলিল, এতক্ষণ তোমার স্ত্রী আত্মীয়-শূন্য গৃহে রমণী পুরে রেখে—তুমি তো খুব উঁচু প্রেমের লম্বা লম্বা কথা কইলে। কিন্তু এটা কি ? বলিয়া নলিনার পরিত্যক্ত বালাজোড়া তুলিয়া ধরিয়া কহিল—যে এতক্ষণ এখানে ছিল, এই দেখ তার ব্রেস্‌লেট। তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে।

পর্দ্দান্তরালে নলিনার বক্ষ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল—অনিলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সত্যেন্দ্র চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া, দেখি—বলিয়া সুশীলের হাত হইতে বালাজোড়া লইয়া দেখিয়া, পরুষ কণ্ঠে কহিল, অনিল আমার স্ত্রীর ব্রেস্‌লেট্‌ তোমার গৃহে আসে কি করে ?

অনিল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল তোমার স্ত্রীর ?

সত্যেন্দ্র কঠোরতর স্বরে বলিল, হাঁ—তুমি জাননা ?

অনিল কহিল—না।

সত্যেন্দ্র কঠিনকণ্ঠে কহিল,—তুমি জান। আমি এর কৈফিয়ৎ চাই।

অনিল, ক্রোধে, অপমানে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র তক্তকণ্ঠে কহিল, উত্তর দাও। নৈলে আমি তোমার ঘর খানাতল্লাস কর্ব্ব। বলিয়া সে অগ্রসর হইল। অনিলের চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। দুই হস্তে সত্যেন্দ্রের গতিরোধ করিয়া সে কহিল—না। আমি তোমায় বাধা দেব! আমার ঘর তল্লাস কর্ব্বার তোমার অধিকার নেই।

সত্যেন্দ্র কহিল, coward! আইন দেখাচ্ছ? আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজব—যে এই ব্রেস্‌লেট্‌ নিয়ে তোমার ঘরে এতক্ষণ ছিল, তুমি তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ—দেখ্‌ব! বলিয়া চারি দিকে চাহিয়া কহিলেন—ঐ পর্দ্দাখানা কাঁপ্‌ছে—ওর আড়ালে নিশ্চয় কেউ আছে। এই বলিয়া সে অনিলকে ঠেলিয়া দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময়—মিঃ সেন! এই বলিয়া সরোজিনী দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যেন্দ্র ফিরিল—সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। সেই অবসরে নলিনী—কম্পিতপদে ভিন্ন দ্বারপথে বাহির হইয়া সকলের অলক্ষ্যে বারাণ্ডা দিয়া নামিয়া গিয়া প্রস্থান করিল। সরোজিনীর বুকের উপর হইতে যেন একটা পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। তিনি মৃদু

হাস্য সহকারে কহিলেন—মিঃ সেন, আপনার বাড়ীতে আমি আজ আপনার স্ত্রীর ব্রেসলেট জোড়া দেখতে নিয়েছিলাম। সেটা দিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি। ফের্ব্বার সময় ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসে, খানিকক্ষণ বসে চলে গেলুম। সেই সময় ব্রেসলেট্‌টা এখানে ফেলে গেছি। ঐ যে! আপনার হাতের ঐ জোড়াটাই না? আপনি অনুগ্রহ করে মিসেস্ সেনকে ওটা ফিরিয়ে দেবেন তো! কি আমাকেই দিন—আমিই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। এই বলিয়া ব্রেসলেট্ লইয়া ধীর পাদবিক্ষেপে দ্বারপ্রান্ত হইতেই ফিরিয়া নামিয়া গেলেন।

সত্যেন্দ্র ঘৃণা ভরে তাঁহার গমনপথের পানে চাহিয়া রহিল অনিল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। চৌধুরী অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সুশীল মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে যখন নলিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল—তখন বেলা নয়টা। সে স্বভাবতঃ প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিত—তীব্র সূর্য্যালোক তাহার চক্ষুতে যেন ধাঁধা লাগাইয়া দিল। কিছুক্ষণ সে কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর ধীরে ধীরে গত রজনীর কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

ওঃ! কি ভয়ানক! সে কি করিতে বসিয়াছিল! যদি কাল—সেই কালরাত্রে সরোজিনী গিয়া তাহাকে না ফিরাইতেন তবে এতক্ষণ কি ঘটিত—তাহা ভাবিতে তাহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এই গৃহে একটা দাসীরও যে অধিকার আছে—তাহাও তাহার থাকিত না! তাহার নিজের ছেলেকে স্পর্শ করিবার অধিকারও তাহার থাকিত না। অথচ তাহার স্বামী—

সরোজিনী শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার স্বামী নির্ম্মল—নিষ্কলঙ্ক! আর যদিই বা তিনি বিপথগামী হইতেন—তাহা হইলেই বা কি! সে ত অবিরত দেখিতেছে, কত বিদুষী সুন্দরীর স্বামী তাহাদের চক্ষের সম্মুখে কেমন অবাধে ব্যভিচারের স্রোত চালাইয়া যাইতেছে। সে হিসাবে সে তো অনেক বেশী পাইয়াছে! আশাতিরিক্ত সৌভাগ্যলাভে তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গিয়াছিল—

ভিক্ষাস্বরূপ যাহা সে পাইয়া আসিতেছিল—তাহাই দাবা জ্ঞান করিয়া—কি নির্লজ্জভাবেই না সে তাহার নিরপরাধ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে! কত রকমে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে! আর সবার উপর—সরোজিনীর উপর কাল প্রভাত হইতে সে কি অবিচারই না করিয়াছে! এই সব ভাবিয়া তাহার মাটিতে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। ছি, ছি! যদি গত ২৪ ঘণ্টাটা তাহার জীবননাট্যের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারা যাইত, তবে তাহা সাধনের জন্য অদেয় তাহার কিছুই ছিলনা।

কেমন করিয়া সে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া—সেই গভীর রাত্রে একাকিনী রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া নিজের গৃহে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল—তাহা তাহার মনেই পড়েনা। অবশ্য পথ বেশী নহে—কিন্তু তাহা হইলেও ইহা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ছিল। তারপর ভাগ্যে সত্যেন্দ্রের অনুপস্থিতি নিবন্ধন ফটক খোলা ছিল—এবং ভাগ্যে দরওয়ান রঘুনন্দন তখন ঘুমাইয়া ছিল! নহিলে—

এই সময় তাহার পুত্রের আয়া সন্তর্পণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জাগরিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন মা?

নলিনী মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—এখনও মাথাটা ধরে রয়েছে। সাহেব ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, এই ভোরবেলা ফিরেছেন।

—এ ঘরে আসেন নি ?

—এসেছিলেন। আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে চলে গেলেন।

তারপর ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, তিনি আপনার ব্রেসলেট্ জোড়াটার নাম করে কি বল্লেন আমি ভাল বুঝ্তে পাল্লুম না। সেটা কি হারিয়ে গেছে মা ? সাহেব বাবুলালকেও জিজ্ঞাসা কচ্চিলেন।

নলিনী কহিল সে হারায়নি। তুমি বাবুলালকে খুঁজ্তে মানা কোরো।

দাসী খুসী হইয়া নলিনীর স্নানের ব্যবস্থা করতে প্রস্থান করিল।

উঃ! এই কয় ঘণ্টায় কি শিক্ষাই না সে লাভ করিয়াছে! সরোজিনীর বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সত্যেন্দ্র কিছুই জানে নাই। কিন্তু এই ব্যাপার স্বামীর কাছে লুকান'—অসম্ভব। সে স্বামীকে সব খুলিয়া বলিবে।

এই সময় সত্যেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া—সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া দিয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিল। পরে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—উঃ, তুমি একরাত্রে কি রকম শুখিয়ে গেছ নলিনী!

নলিনীর বক্ষ যেন জুড়াইয়া গেল। সে একান্ত নির্ভরে স্বামীর

ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, দুই হস্তে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—কাল রাত্রে মোটে ঘুম হয়নি!

সে স্বামীর মুখের পানে চাহিতে পারিল না। তাহার কোলে মুখ লুকাইল। অশ্রু আর চাপিয়া রাখা যায় না!

—আমিও কাল অনেক রাত্রে এসেছি। তোর আজ সকালে বল্লেই হয়। চৌধুরী সাহেবের পাল্লায় পড়ে—এই সময় উরুদেশে নলিনীর অশ্রু অনুভব করিয়া সত্যেন্দ্র সস্নেহে কহিল, নলিনী, তুমি কাঁদছ?

নলিনী কথা কহিতে পারিল না! নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র তাহার মস্তকে, পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। পরে কহিল, নলিনী তোমার শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল হয়েছে দেখ্‌ছি। চল—আমরা কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি। এই সময় মধুপুরের Climate ও ভাল আর আমাদের সেখানকার বাড়ীটাও এখন খালি রয়েছে। এখন নটা। রাত্রে সাড়ে আটটায় পঞ্জাব মেল। চল আজই যাওয়া যাক্!

নলিনী যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারে পথের সন্ধান পাইল। সে স্বামীকে অবলম্বন করিয়া উৎসাহে উঠিয়া বসিল। কহিল—চল। কিন্তু পরক্ষণেই যেন কি ভাবিয়া নিরস্ত হইয়া কহিল, কিন্তু আজ তো যাওয়া হয় না! আমায় একজন বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে যে!

সত্যেন্দ্র সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, বিশেষ বন্ধু!

ভগ্নীর মৃত্যুর পর, নলিনীর বিশেষ বন্ধু কেহ আছে বলিয়া তাহার জানা ছিল না।

নলিনী তাহার বিস্ময় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া কহিল,, তারও বাড়া। সে কে—তাও বল্‌ছি। কিন্তু বল—তুমি আমার ঠিক আগেকার মত ভালবাস্‌বে! এই বলিয়া সে পুনরায় স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইল।

—আগেকার মত? নলিনী, তুমি হয়তো সরোজিনীর কথা ভাব্‌ছো। কিন্তু আমি তোমায় বল্‌ছি, তোমার সে ভয় কর্ব্বার কোনও কারণ নেই। এই বলিয়া সত্যেন্দ্র তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিল!

নলিনী কহিল, আমি তা ভাবিনি। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, কাল তোমাকে কটুবাক্য বলে আমি কি অন্যায় করেছি! তুমি আমায় মাপ কর্ব্বেনা? এই বলিয়া সে স্বামীর বক্ষে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র পুনরায় তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল, আমি কিছু মনে করিনি। তুমি নেহাৎ ভাল মানুষ, তাই তুমি তাকে অপমান করনি। কিন্তু একপক্ষে তাই কল্লেই ভাল হত।

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে রোষ দমন করিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, আর কখনও তোমাকে তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হবে না।

কেন?—বলিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ চক্ষুদুইটি মেলিয়া সানুনয়ে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

জন্ম তিথি

সত্যেন্দ্র কহিল, নলিনী! আমি মনে কর্ত্তুম যে, হয়ত মুহূর্ত্তের ভ্রমে পদস্খলিত হয়ে—আজীবন সে প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছে। কিন্তু না। সে পাপী। সমস্ত দোষ তার ইচ্ছাকৃত। তার প্রতি আমার আর সহানুভূতির লেশমাত্র নাই।

নলিনী পুনরায় স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া আদরের সুরে বলিল, তুমি তাঁর সম্বন্ধে এ রকম করে বোল না। বল—বল্‌বে না?

সত্যেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া কহিল, আচ্ছা—বল্‌ব না। কিন্তু তুমি আর কখনও তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পাবে না। সে ভদ্রসমাজের অযোগ্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্নানান্তে চুলগুলি এলো করিয়া দিয়া নলিনী সত্যেন্দ্রের সহিত তাহাদের শিশু-পুত্রকে লইয়া চা পান করিতে লাগিল। একটা ছোট কাপে করিয়া তাহাকেও এক কাপ চা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চা অপেক্ষা ফুলদানের ফুলগুলির উপর ঝোঁকটা তাহার কিছু অধিক। সে মায়ের কোল এবং বাপের কোল অনেকবার বদল করিয়া, উভয়ের নিকট হইতে অজস্র চুম্বন আদায় করিয়া, শেষে টেবিলের উপর উঠিয়া বসিল। তখন বাটি ভাঙ্গিবার আশঙ্কায় আয়া আসিয়া তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। সে অনেকবার আপত্তি জানাইয়া—শেষে খরগোস দেখিবার লোভে প্রস্থান করিল। শিশুর মধ্যস্থতায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবশিষ্ট ব্যবধানটুকু কাটিয়া গেল। কথায় কথায় অনিলের গৃহত্যাগের বিষয় সত্যেন্দ্র নলিনীকে জানাইল। বিশেষ দুঃখিত হইলেও, নলিনী যেন স্বস্তি বোধ করিল। আর নিজের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না।

তারপর উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সত্যেন্দ্র বলিল, কাল আমাদের বাড়ী একটা প্রেমের কাণ্ড হয়ে গেছে। নলিনীর বুকটা ছাৎ করিয়া উঠিল। হায়! যদি স্বামী আসিবামাত্রই সে সব কথা খুলিয়া

বলিত! ছি, ছি লজ্জায় তাহার মাটিতে মিশাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার চিন্তাদূর করিয়া সত্যেন্দ্র কহিল, কাল এমি গুপ্তার সঙ্গে মিঃ সরকারের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। শুনিয়া নলিনী আশ্বস্ত হইয়া হাসিতে লাগিল। তারপর কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর নলিনী কহিল—দেখ, একটি কথা বলব—রাগ কর্বে না তো?

সত্যেন্দ্র মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

—মিসেস্ দাসকে এখানে ডেকে পাঠিয়ে, আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ব।

সত্যেন্দ্র স্থিরভাবে বলিল—না। বলিয়া নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

নলিনী রঙ্গ করিয়া কহিল, বাবে! আমি যখন আপত্তি করেছিলুম—তখন তোমার ইচ্ছায় কাল তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আজ তুমি আপত্তি কচ্ছ বলে আমার কথাটা বুঝি থাকবে না?

সত্যেন্দ্র কৌতুক বোধ করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার আপত্তি করিবার আর যো ছিল না। শেষে বলিল, কিন্তু তাকে আস্তে না দেওয়াই উচিত।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

সত্যেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, নলিনী! কাল আমাদের বাড়ী

থেকে মিসেস্ দাস কোথায় গেছল যদি জান্তে, তবে তুমি তার সঙ্গে এক জায়গায় বসতে চাইতে না।

নলিনী আহত হইল। তাহার জন্য যে একজন লোকের চক্ষে এতদূর হীন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ইহা তাহার প্রকৃতির বহির্ভূত ছিল। মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া সে কহিল—দেখ, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

এই সময় বাবুলাল আসিয়া ব্রেসলেটটা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল, মিসেস দাস এই ব্রেসলেট জোড়া কাল ভুল করে নিয়ে গেছলেন—তাই ফেরৎ দিলেন। পরে নলিনীর পানে চাহিয়া কহিল, তিনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে চান।

নলিনী কহিল, তাঁকে এইখানেই আসতে বল।

বাবুলাল প্রস্থান করিল। সত্যেন্দ্র মুখখানা গোঁজ করিয়া রহিল। সরোজিনী প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাইত, তাঁহার মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের প্রফুল্ল। সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া, আরও জোর করিয়া হাসিয়া সরোজিনী কহিলেন—আপনাদের ব্রেসলেটটা আমি ভুল করে নিয়ে গেছলাম! আশা করি তার জন্যে আপনারা আমায় মাপ করেছেন। যদি না করে থাকেন—তবে আজ আমি আপনাদের কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি, অন্ততঃ এ ভেবেও আপনারা আমায় মাফ্ করুন।

নলিনী সবিস্ময়ে কহিল, সে কি, আপনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?

সরোজিনী সংক্ষেপে বলিলেন—হাঁ। কলকাতা আমার সহ্য হ'ল না। আমি শীঘ্রই যাব।

নলিনী ব্যথিতের ন্যায় বলিল, আপনার সঙ্গে আর তাহলে দেখা হবে না?

সরোজিনী কহিলেন, না। আমি আর এখানে ফিরব না। অন্ততঃ ইচ্ছা নেই। যাবার আগে আমি তোমার কাছে থেকে তোমার একখানা ফটোগ্রাফ নিয়ে যেতে চাই। আমায় দেবে?

অতি বিনয়-নম্র স্বর। শুনিলে মনে হয়, নলিনার ফটোগ্রাফ লাভ বুঝি তিনি দুরাশা বলিয়া জ্ঞান করেন। নলিনীর কর্ণে সে করুণ প্রার্থনা বাজিল। সে সজোরে কহিল, নিশ্চয়ই। পাশের ঘরেই আমার একখানা ফটো আছে। আমি এখনই আনছি। বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নলিনী যাইবামাত্র সত্যেন্দ্রের মুখ কঠিন ভাব ধারণ করিল। সে শ্লেষ ও ক্রোধ পূর্ণ স্বরে কহিল, কাল রাত্রের সেই নির্লজ্জ আচরণের পর—আজ এখানে আস্‌তে আপনার বাধ্‌লো না?

সরোজিনী উত্তর দিবার পূর্বেই নলিনী ফটো হস্তে পুনরায় প্রবেশ করিল। সে ঘরে ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কিন্তু এ ছবিতে আমায় অন্যায় করে বাড়ানো হয়েছে। আমি এত

সুন্দরী নই। বলিয়া সে সস্মিত ভাবে সত্যেন্দ্রের দিকে চাহিল।

ফটো দেখিয়া. কণ্ঠস্বরে স্নেহের উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিয়া তিনি কহিলেন—তুমি ছবির চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার একখানা ছবি আমি পাই না?

নলিনী সলজ্জ হাস্যে বলিল, তাও আছে। এনে দেব?

সরোজিনী সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, যদি দাও!

—সে ছবিগুলা ওপরে আছে। আমি আনছি। বলিয়া নলিনী পুনরায় বাহির হইয়া গেল। তখন সত্যেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া সরোজিনী কহিলেন, আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন?

সত্যেন্দ্র কহিল, হাঁ—আপনার পাশে আমার পত্নীকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমায় প্রবঞ্চনা করেছেন।

সরোজিনী বলিলেন, কেন, আমি তো আপনার স্ত্রীকে কোনও কথা বলি নি!

সত্যেন্দ্র কহিল, এখন আমার মনে হয়, বল্লেই ভাল হত। তাহলে গত কয়েক মাস ধরে যে বিরক্তি ও উদ্বেগে আমি দিন যাপন করেছি—তার প্রয়োজন হত না। কিন্তু আমি অন্যরূপ বুঝেছিলাম। যে জননীকে মৃতা জেনে—স্বর্গাদপি গরীয়সী জ্ঞানে যাকে আমার পত্নী পূজা করে এসেছে—তার চক্ষে তাক

জীবিতা, গৃহত্যাগিণী, ছদ্ম-বেশিণী প্রতিপন্ন করে, তার বুক না ভেঙ্গে দিবার জন্য, আমি মুক্ত হস্তে অর্থ দান করে আপনার বিলাসের অপব্যয় যুগিয়ে এসেছি। এমন কি যা আমাদের বিবাহিত জীবনে কখনও হয় নি—সে রকম কথা কাটাকাটি পর্যান্ত নীরবে সহ্য করেছি। সে যে আমার কি মর্ম্মান্তক হয়েছে—তা আপনি কি বুঝবেন? শুধু এইটুকু জেনে রাখুন—যে আমার প্রিয়বাদিণী পত্নীর মুখে আমি একদিন মাত্র কটু-বাক্য শুনেছি। সে আপনার জন্য। আর এও জেনে রাখুন, যে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আর যাই হোন আপনি সত্যবাদিনী। কিন্তু সে বিশ্বাস সে ভ্রম, আমার দূর হয়েছে।

সরোজিনী প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়াছিলেন। শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

সত্যেন্দ্র বলিল, কাল আমার স্ত্রীর জন্মতিথি উপলক্ষে আপনাকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ কত্তে আপনি অনুরোধ করেছিলেন।

কি যেন নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া সরোজিনী কহিলেন—হাঁ।—আমার মেয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে!

—তারপর সেই রাত্রে আমাদের গৃহ থেকে আপনি আর একজন যুবা পুরুষের গৃহে গিয়েছিলেন। বলিতে বলিতে তাহার শ্লেষোক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল। সে কহিল, কাল সকলের চক্ষে আপনি ব্যভিচারিণী কলঙ্কিনী বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন।

সরোজিনী চুপ করিয়া রহিলেন।

সত্যেন্দ্র কঠিন কণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল, সুতরাং আমারও আপনাকে সেই চক্ষে দেখ্‌বার অধিকার আছে। সে অধিকার আপনিই—নিজের দোষে আমায় দিয়েছেন। সেই অধিকারে আমি আপনাকে বলে দিলুম—ভবিষ্যতে এ বাড়ীতে ঢোক্‌বার চেষ্টা আপনি কর্বেন না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাইবেন না।

পুনরায় সত্যেন্দ্রকে বাধা দিয়া সরোজিনী কহিলেন, আমার মেয়ের সঙ্গে?

সত্যেন্দ্র শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, তার জননী হবার গৌরব আপনি কর্ত্তে পারেন না। শৈশবে আপনি তাকে ত্যাগ করেছেন। উপপতির জন্য—আপনি আপনার সন্তানকে ত্যাগ করেছিলেন—প্রতিদানে সেই উপপতি আপনাকে ত্যাগ করেছে। যান—আপনাকে জান্তে আমার বাকী নেই।

মিসেস দাস মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে!

সত্যেন্দ্র কহিল, কিন্তু আমার নেই। আমি আপনাকে ভাল করেই চিনেছি। ষোল বৎসর আগে আপনি যে শিশুকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এই দীর্ঘ যুগের মধ্যে কখনও তাকে আপনি একবার স্মরণও করেন নি। তারপর তার বিবাহের

পর তাকে ধনশালিনী জেনে—আপনি এই সুযোগে কিছু হাতিয়ে নেবার মতলবে, তার জীবনের পথে কণ্টকের মত এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর ভদ্র সমাজে চালাবার জন্যে আপনার বারংবার অনুরোধে, আমার স্ত্রীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আমি কাল আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। হয়ত এর ফলে আপনি ভদ্র সমাজে চলেও যেতেন। কিন্তু কাল—গলার হার, অনিলের পরিজনশূন্য গৃহে একাকিনী সেই অবস্থায় ধরা পড়ে, সে আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কাল সবাই আপনাকে হীন বার-বিলাসিনী বলে জেনেছে।

সরোজিনী স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন।

সত্যেন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল, তারপর আমার স্ত্রীর নেকলেটটা নিয়ে গিয়ে আপনি কলঙ্কিত করেছেন। আমি আমার স্ত্রীকে আর কখনও এটা পরতে দেব না। আপনি ওটা আর ফিরিয়ে না এনে, নিজের কাছে রাখলেই ভাল করেন।

কিন্তু সরোজিনী এবার কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, বেশ—আমিই এটা রেখে দেব; আমার কন্যার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ। নলিনীর কাছে আমি এই নেকলেস জোড়া চেয়ে নেবো।

সত্যেন্দ্র ঘৃণাভরে কহিল, আমি তাকে অনুরোধ করব—যাতে সে আপনাকে ওটা দিয়ে দেয়। আরও এক কথা। একটি বালিকার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিকে জননীর শৈশবের চিহ্ন জেনে, আমার

স্ত্রী প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় প্রণাম করে। সেখানেও আপনি নিয়ে যান।

সরোজিনীর বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র পুনর্বায় শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আজ হঠাৎ যে আপনি এখানে এসে পড়েছেন? কি মৎলব বলুন তো?

সরোজিনী কহিলেন, আমার মেয়ের কাছ থেকে চির-বিদায় নিতে এসেছি—মিঃ সেন।

সত্যেন্দ্র রোষে অধর দংশন করিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া সরোজিনী কহিলেন, না না মনে করবেন না যে আমি গলা বাড়িয়ে আত্ম প্রচার করে একটা করুণ দৃশ্য সংঘটন কর্ত্তে এসেছি। মা হবার উচ্চাশা আমি পোষণ করি না। একবার—জীবনে একবার মাত্র আমি নিজের অন্তরের মধ্যে মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছি। সে কাল রাত্রে। কিন্তু সে যে কি করুণ—সে যে কি মর্ম্মস্পর্শী, তা প্রকাশ কর্ব্বার ভাষা আমার নেই। যুগেরও অধিককাল—দীর্ঘ ষোল বৎসর আমি সন্তানকে না দেখে কাটিয়েছি। জীবনের বাকী কটা দিনও তাকে না দেখেই আমার চলে যাবে। আমাকে মা বলে জানবার চেয়ে, মেয়ে আমার তার মৃতা—নিষ্কলঙ্কা জননীর স্মৃতিই পূজা করুক, আমি বিদায় গ্রহণ করি। আপনি হয়তো মনে কচ্ছেন যে, আমি একটা অনাথাশ্রম স্থাপন কর্ব্বো বা হাঁসপাতালে সেবাব্রত ধারণ কর্ব্ব—বা ঐ রকম একটা কিছু কর্ব্ব। আজকাল উপন্যাসে ঐ

রকমই সব লেখা থাকে—মৃদু ঔপন্যাসিকের হস্তে আমার চরিত্রের বোধ হয় ঐ রকমই পরিণতি হ'ত। কিন্তু না—অত শক্তি বা ত্যাগ আমার মধ্যে দুর্লভ। মিঃ চৌধুরী আমায় বিবাহ কর্ত্তে চাইছেন। আমি তাঁকে বিবাহ কর্ব্ব। আমার জীবনটাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কর্ব্ব। আর—আর আপনাদের পথ থেকে আমি সরে দাঁড়াব এই মাত্র। আপনাদের সংস্পর্শে আসা আমার ভুল হয়েছে। কাল আমি তা বুঝেছি।

সত্যেন্দ্র কহিল—নিশ্চয়ই। কিন্তু অতঃপর আপনি থাকুন বা যান, তাতে আমার কিছুমাত্র এসে যাবে না; কারণ, আমি আপনাকে আজ সব কথা খুলে ব'লব স্থির করেছি।

সরোজিনী চমকিয়া উঠিলেন, পরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, যদি আপনি তাকে এসব কথা বলেন, তাহলে আমি নরকের নিম্নতম স্তরেও নামতে দ্বিধা কর্ব্বনা। আপনার পত্নীর জীবন আমি দুর্ব্বহ করে তুলব। আমি নিষেধ করছি। তাকে এ কথা বলবেন না।

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া তিনি কহিলেন, যদি বলি যে আমি তাকে ভালবাসি— আপনি আমায় অবিশ্বাস করবেন?

সত্যেন্দ্র কহিল, হাঁ। জননীর স্নেহ অর্থে ত্যাগ—আত্মদান, স্বার্থবলি। আপনি তার কোনটা করেছেন আপনার সন্তানের জন্য?

ম্লান হাসি হাসিয়া সরোজিনী কহিলেন, ঠিক বলেছেন, আমি তার কোনটা করেছি? কিন্তু সে কথা যাক্। আমার মেয়েকে আমার পরিচয় দিতে আমি আপনাকে কোনমতেই দেব না। যদি বল্‌তে হয়, যদি বলা উচিত বিবেচনা করি—তবে আজ এখান থেকে যাবার পূর্ব্বে—আমিই তাকে সব কথা বলে যাব। নতুবা আমি যেমন রহস্যময়ী আছি—এমনিই থাক্‌ব।

সত্যেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তবে আপনি এখনই যান—নলিনীকে যা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তা আমিই দেব।

ঠিক এই সময় নলিনী ফটোগ্রাফ হস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

—মাপ কর্বেন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ! আমি ছবিখানা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। পরে সত্যেন্দ্রের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, উনি কবে দুষ্টামি করে আমার বাক্স থেকে সরিয়ে ওঁর ড্রয়ারের ভেতর রেখে দিয়েছিলেন—আমি জানতে পারিনি।

মিসেস্ দাস ছবিখানা হাতে লইয়া কহিলেন, এই তোমার ছেলে? বাঃ! ঠিক তোমার মত! কি নাম রেখেছ?

—আমার বাবার নাম ছিল যতীশ; তাই তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম রেখেছি সতীশ।

সত্যি?

—হাঁ! যদি মেয়ে হত, আমার মায়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখতুম। আমার মায়ের নাম ছিল জ্যোৎস্নাময়ী।

—সত্যি? আমায় স্বামীও আমায় ঐ নামে ডাকতেন।

সত্যেন্দ্র রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাঁহার পানে চাহিল। সরোজিনী পুনরায় কহিলেন, তোমার স্বামী আমায় বলছিলেন—তুমি তোমার মাকে খুব ভক্তি কর।

নলিনী কহিল, মিসেস্ দাস, সকলেরই একটা না একটা আদর্শ থাকে। আমার আদর্শ—আমার জননী!

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। সে পুনরায় কহিল, যদি কোনও ক্রমে সে আদর্শ হারাই—তবে আমি সব হারাব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজিনী কহিলেন, তোমার বাবার কাছে তোমার মার কথা কখনও শোনোনি?

নলিনী বলিল, না, তাঁর কথা উঠলে তাঁর বড় কষ্ট হত। শুধু একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন যে, আমার দুবছর বয়সের সময় আমার মা মারা গেছেন। বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। কোনও প্রসঙ্গে মার কথা তুলতে তিনি আমায় নিষেধ করেছিলেন। তাতে তিনি বড় ব্যথা পেতেন। মাতৃশোকেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। মা মারা যাবার পরে, তিনি মদ খেয়ে একরকম আত্মহত্যাই করেছিলেন।

সরোজিনী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অন্যদিকে ফিরিয়া কহিলেন—আমি তাহলে আসি।

নলিনী ব্যথিতস্বরে কহিল,—এত শীঘ্র!

—হাঁ, একটু কাজ আছে। আমার গাড়ীখানা এসেছে? মিঃ চৌধুরীকে আনতে আমি গাড়ী পাঠিয়েছিলুম।

আমার দিকে চাহিয়া নলিনী কহিল, একবার বাবুলালকে দেখতে বলনা!

সত্যেন্দ্র ক্ষণমাত্র ইতস্তত করিয়া প্রস্থান করিল। সরোজিনীকে

একাকিনী পাইবামাত্র নলিনী কহিল, কাল আপনার দয়াতেই আমি রক্ষা পেয়েছি। কি বলে আমি আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব?

সরোজিনী অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, চুপ!

নলিনী কহিল—না, তারপর সেখানে যা ঘটেছিল, আর সবাই—এমন কি আমার স্বামী পর্য্যন্ত আপনাকে সেজন্য দোষী ভেবেছে—আমি তা জানি। আমার জন্যে এতদূর অপবাদ সইতে আপনাকে আমি দেব না। আমি আমার স্বামীকে সব কথা খুলে বলব। নতুবা আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে।

ক্ষণমাত্র বিচলিত হইয়া সরোজিনী মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া বলিলেন, কিন্তু স্বামী ছাড়া অপরের প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য আছে—একথা বোধ হয় তোমার মত [illegible] অস্বীকার করবে না! তুমি বলছিলে না, তুমি আমার কাছে ঋণী?

নলিনী আবেগের সহিত কহিল—শুধু ঋণ? এ ঋণ শোধ হয় না!

—বেশ, তবে এ কথা প্রকাশ না করে তুমি সে ঋণ শোধ দাও। শোন, আমি জীবনে একটিমাত্র সৎকার্য্য করেছি। সকলের কাছে তা প্রকাশ ক'রে দিয়ে তুমি তা ব্যর্থ করে দিও না! প্রতিজ্ঞা করো যে, তুমি সে কথা কখনও প্রকাশ করবে না।

নলিনী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু আমি ভেবেছিলুম

আপনাকে আমার জন্য এতদূর স্বার্থ বলি দেওয়ানর চেয়ে—অবশ্য আপনি যদি জোর করেন—

দুই হস্তে নলিনীর দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া সরোজিনী কহিলেন —হাঁ, আমি জোর কর্‌ছি—মিনতি কর্‌ছি। তুমি এ কথা কখনও প্রকাশ ক'রনা। এই আমার একান্ত অনুরোধ। বল, তুমি আমার কথা রাখ্‌বে?

নলিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আপনার কথা ঠেল্‌বার সাধ্য আমার নেই। আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি—সে কথা কখনও প্রকাশ কর্‌বনা।

সরোজিনী তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, আর একটি আমার উপদেশ—তুমি যে সন্তানের জননী, এ কথা কখনও বিস্মৃত হোয়ো না।

নলিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। সেই কথা বিস্মৃত হয়েছিলুম ব'লেই কাল আমি অতদূর এগুতে পেরেছিলাম। সে কথা আমি কখনও ভুলব' না।

এই সময় সত্যেন্দ্র পুনরায় আসিয়া কহিল, আপনার গাড়ী এখনও আসে নি।

—আচ্ছা, তাহলে একখানা গাড়ী ডেকেই নেব। আমি আসি তাহলে—এই বলিয়া সরোজিনী আর ক্ষণমাত্র সেখানে দাঁড়াইলেন না। দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

জন্ম তিথি

তাঁহার ব্যথার ব্যথী জগতে কেহই ছিল না। শুদ্ধ তাঁহার নিজের কন্যা—তাঁহাকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় জানিয়াও, সময় সময়, সকলকে লুকাইয়া, গোপনে তাঁহার জন্য দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিত।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী

মকরী—(ত্রয়াঙ্ক গীতিনাট্য)।

চব্বিশ ঘণ্টা—(নাটিকা) এক অঙ্কে সম্পূর্ণ।

চিড়িয়াখানা—(প্রহসন) এক অঙ্কে সম্পূর্ণ।

মৃত্যু-মিলন—বিয়োগান্ত নাটক।

মানুষ—(স্বাস্থ্যতত্ত্ব) শিশুপাঠ্য।